ইওর অনার

নিমাই ভট্টাচার্য

মিত্র ও ঘোষ

১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

সবিনয় নিবেদন,

বেশ ক'বছর আগে 'রাজধানীর নেপথ্যে' লেখা থেকে আপনাদের সঙ্গে আমার প্রথম যোগাযোগ। তারপর ভি-আই-পি, পার্লামেণ্ট স্ট্রীট, মেমসাহেব, ডিপ্লোম্যাট, ককটেল, তোমাকে, ম্যাডাম, লিখে সে যোগাযোগ আরো গভীর ও দৃঢ় হয়েছে এবং এজন্য আপনাদের সবার কাছে আমি অপরিসীম ঋণী।

সম্প্রতি কলকাতার বইয়ের বাজারে আরেক নিমাই ভট্টাচার্যের বই বেরিয়েছে। হয়তো আরো বেরোবে. সেজন্য আপনাদের সবার কাছে আমার একান্ত অনুরোধ, আমার বই কেনার আগে অনুগ্রহ করে আমার লেখা বইয়ের তালিকা ও মুদ্রিত স্বাক্ষর দেখে নেবেন।

সকৃতজ্ঞ

নিমাই ভট্টাচার্য

পরনে সাদা প্যাণ্ট, গায়ে কালো কোট, মাথায় খাকি শোলার হ্যাট। হঠাৎ দেখলে মনে হবে, ভাগলপুর স্টেশনের টিকিট কালেক্টর অথবা এ-এস-এম। অ্যাসিসট্যাণ্ট স্টেশন মাস্টার। তবে ওদের মত শিকারী বেড়ালের চোখ নয়। চোখ দুটো ভাবগম্ভীর। কেমন যেন উদাসীন। বোধহয় একটু ক্লান্তও। মনে হয়, এই পৃথিবীতে আজন্ম কি যেন খুঁজছেন কিন্তু শহরে নগরে, মানুষের জনারণ্যে, অরণ্য-পর্বতেও তার সন্ধান পাননি। তাই ক্লান্ত।

শোলার হ্যাটের তলায় ধবধবে সাদা চুল। কোনকালে এই মাথায় কালো চুল ছিল বলেও মনে হয় না। এই বয়সে মাথায় পাকা চুল থাকে। থাকবেই কিন্তু শুধু বয়সের জন্য এত সাদা হতে পারে না। তবে কি চিন্তায়?

একলা থাকলেই মানুষটা কোথায় যেন হারিয়ে যান, তলিয়ে যান। সামনের চেয়ারে বসে থাকলেও মনে হয়, কন্যা কুমারিকা বা মানস সরোবরে অথবা আরো দূরের কোন স্মৃতির অরণ্যে পথ হারিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। নির্ভয়ে, নিশ্চিন্তে। মনে মনে কত কথা বলছেন, কত কথা শুনছেন। সুরের মূর্ছনায় মনের মধ্যে আনন্দের ঢেউ উঠছে। একের পর এক। ঠিক পুরীর সমুদ্রের মত। সে আনন্দের ঢেউতে ভাসতে ভাসতে উনি যেন কোন অচিনদেশে চলে যান। বিভোর হয়ে যান। শ্বেত পাথরের মত ফরসা মুখখানায় কোন ভাবের প্রকাশ

হয় না কিন্তু স্বচ্ছ ছুটি চোখের কোণায় হঠাৎ বিদ্যুতের ঝলকানি দেখা যায়। দিনের বেলায় জোনাকির আলোর মত সে বিদ্যুতের আত্ম-প্রকাশ বাইরের মানুষের কাছে ধরা দেয় না।

সত্যি এক বিচিত্র মানুষ এই সূর্যদা। ওর পাশে পাশে থেকেও কাছে যাওয়া যায় না; কাছাকাছি গিয়েও ঘনিষ্ঠ হওয়া যায় না। মুখ দেখে মনের হদিশ পাওয়া অসম্ভব। কে যেন বলেছিলেন, ফেস্ ইজ দ্যা ইনডেক্স অফ্ মাইণ্ড কিন্তু কথাটা সবার বেলায় সত্য হলেও সূর্যদার বেলায় প্রযোজ্য নয়।

সূর্যদা হাসেন। হাসি-ঠাট্টা করতে উনি ভালইবাসেন কিন্তু তবু যেন মনে হয় অঘ্রানের হিমের মত আলতো করে বেদনার ছোঁয়া লেগে আছে ওর সারা মুখে। সূর্যদা বোধহয় বিশেষ সুখী না কিন্তু দুঃখী বলেও তো মনে হয় না। উনি যেন সাধারণ মানুষ না কিন্তু অসাধারণ ভাবতেও দ্বিধা হয়। সূর্যদা অনন্য না হলেও নিশ্চয়ই স্বতন্ত্র।

ভাগলপুর কোর্টে কত উকিলের ভীড়। বোধহয় পাঁচ-সাত শ' উকিলবাবুকে পাওয়া যাবে কোর্টের আনাচে-কানাচে। সবাই ব্যস্ত; সবাই ব্যগ্র। উৎকণ্ঠিতও। অনেকেই ছোটাছুটি-দৌড়াদৌড়ি করছেন এদিক থেকে সেদিক, সেদিক থেকে এদিক। হঠাৎ দেখে মনে হবে, বিশ্ববিধাতার সর্বোচ্চ আদালতে এখনই এই সংসারের সব মানুষের বিচার শুরু হবে। যারা দৌড়াদৌড়ি করছেন না, তারাও বার লাইব্রেরীতে বসে দাঁড়িয়ে মক্কেলদের সঙ্গে আলোচনায় ডুবে আছেন।

মোটকথা এখানে সবাই ব্যস্ত। মক্কেলদের উৎপাতে সবাই বিব্রত। সি-আর-পি-সি ও আই-পি-সি'র জট ছাড়াবার চিন্তায় সবাই চিন্তিত। যাদের হাতে কোন মামলা-মোকদ্দমা নেই, মক্কেলরা যাদের খোঁজাখুঁজি করছেন না, তারাও ব্যস্ততার ভান করে ঘুরছেন এখানে-ওখানে; অথবা বার লাইব্রেরীতে বসে বসে এফিডেভিটের কাগজখানা মুখের সামনে ধরে রেখেছেন।

সূর্যদা এদের একজন হয়েও যেন এদের সমগোত্রীয় না। ওর কোন ব্যস্ততা নেই ; বোধহয় ব্যগ্রতাও নেই। তাই তো ভাগলপুর কোর্টের কয়েক শ' উকিলের ভীড়েও সূর্যদা হারিয়ে যান নি।

বেল পিটিশন মুভ করে অথবা মামলার নতুন ডেট নিয়ে উকিল-বাবুরা একে একে ফিরে আসেন। ছোট্ট ঘরখানা আস্তে আস্তে ভরে ওঠে।

আরে সূর্যদা, বিলকুল চুপচাপ।

কথা বেচা যাদের পেশা, তাদের কাছে নীরবতা বোধহয় অসহ্য। তাই সূর্যদা কিছু বলার আগেই নানা জনে নানা মন্তব্য করলেন।

শঙ্করবাবু বললেন, নীরবতাই ত সূর্যদার ভাষা।

তারাবাবু বললেন, আরে বাপু, সূর্যদা কি আমাদের মত বকবক করেন ? হি কমাণ্ডস্ !

সুভাষবাবু মুচকি হেসে বললেন, বিনোবাজীর মত সূর্যদাও মৌন থাকবেন ঠিক করেছেন।

চন্দ্রকুমার এদের মধ্যে সব চাইতে নবীন। সে বললো, সূর্যদা মৌন ব্রত নিলে আমাদের কে গাইড করবে।

সুনীল সেন ক্রিমিন্যাল কেস করে করে সব ব্যাপারেই সি-আর-পি-সি'র কোন একটা সেকশনের কথা না বলে পারেন না। বললেন, শুধু থ্রী সেভেনটি সিক্সের মামলা লড়তে গেলে এরকম চুপচাপ বসে ভাবতেই হবে।

তারাবাবু বললেন, রেপ কেসের মামলা লড়া সূর্যদা বহুকাল ছেড়ে দিয়েছেন।

ফটিকবাবু এদের চাইতে অভিজ্ঞ ও প্রবীণ। তিনি বললেন, আর গুজব ছড়াতে দেওয়া ঠিক না সূর্যদা। আপনি কি ভাবছেন বলেই ফেলুন।

সূর্যদা গম্ভীর হয়ে বললেন, এ্যান্ ইভেণ্ট হ্যাজ হ্যাপনড্ আপন হুইচ্ ইট ইজ ডিফিকাণ্ট টু স্পীক এ্যাণ্ড ইম্‌পসিবল টু বী সাইলেণ্ট।

সবাই একসঙ্গে মন্ত্রোচ্চারণের মত বিড়বিড় করে আবৃত্তি করলেন, ডিফিকাণ্ট টু স্পীক কিন্তু ইম্‌পসিবল টু বী সাইলেণ্ট।

সুনীল সেন সাহস করে জিজ্ঞাসা করলেন, এটা কার জাজমেণ্ট থেকে বললেন সূর্যদা ?

শিষ্যদের এই অজ্ঞানতা দেখে ভাগলপুর বার লাইব্রেরীর মুকুটহীন সম্রাট আর নীরব থাকতে পারেন না। একটু কৃপার হাসি হেসে সূর্যদা বললেন, কোর্ট-কাছারি মামলা-মোকদ্দমা জাজমেণ্টের বাইরেও একটা জগৎ আছে, তা জান ?

তারাবাবু হাসতে হাসতে বললেন, এর বাইরের জগৎ বলতে ত স্ত্রীর খোসামোদ করাই জানি।

ফটিকবাবু তাড়াতাড়ি কথার মোড় ঘুরিয়ে বললেন, সূর্যদা, আপনি শিষ্যদের এমনভাবে মিথ্যে কথা বলা শিখিয়েছেন যে জানলেও ওরা সত্যি কথা বলতে পারে না।

ইউ আর রাইট ফটিকবাবু। সূর্যদা একটু হেসে বললেন, তাহলে একটা সত্যি ঘটনা বলি।

শুধু ফটিকবাবু ছাড়া সবাই একসঙ্গে বলে উঠলেন, সত্যি !

হ্যাঁ, হ্যাঁ, সত্যি। আমি কি সব সময় গুল মারি ?

মারেন না ?

না। নট অলওয়েজ। এবার সূর্যদা সত্যি শুরু করলেন, তখন লংম্যান সাহেব সেসন জজ। অত্যন্ত রসিক লোক আর আমাকে খুব পছন্দ করতেন।

সুনীল সেন কথায় কথায় টিপ্পনী না কেটে পারেন না। জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা সূর্যদা, সব সাহেব জজই কী আপনাকে ভালবাসতেন ?

তারাবাবুও যে ভাল উকিল, সে কথা প্রমাণ করার জন্য উনি বললেন, আর সব ইণ্ডিয়ান জজই সূর্যদাকে অপছন্দ করেন।

প্রাণাধিক শিষ্যদের বাচালতায় সূর্যদা মনে ব্যথা পান। বলেন, ডোণ্ট পুট ইট দ্যাট ওয়ে। যাদের জীবনবোধ নেই, সাহিত্য-প্রীতি নেই, রসজ্ঞান নেই, তারা আমাকে পছন্দ করেন না।

ফটিকবাবু বললেন, আপনি ওদের আজেবাজে কথায় কান দেবেন না। লংম্যান সাহেবের কথা বলুন।

সূর্যদা একটু নড়ে-চড়ে বসে বললেন, লংম্যান সাহেবের কোর্টে একটা মার্ডার কেসের আর্গুমেণ্ট করতে করতে বললাম, ইওর অনার, প্লেটোর নাম সবাই জানেন। বেনজামিন জোয়েট প্লেটোর রিপাবলিক অনুবাদ করেন এবং তিনি তার ভূমিকাতে বলেন, দ্যা লাই ইন দ্যা সৌল্ ইজ এ ট্রু লাই। ইওর অনার, আমি মিথ্যা বললেও তা হচ্ছে আমার প্রাণের মিথ্যা, আমার আত্মার মিথ্যা, আমার……

লাভলি! লাভলি! শিষ্যদের উল্লাসে সূর্যদা কথাটা শেষ করতে পারলেন না।

ফটিকবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, লংম্যান সাহেব কি বললেন?

হাজার হোক খাঁটি আইরিশের বাচ্চা! লংম্যান সাহেব হাসতে হাসতে বললেন, আই নো ইউ আর ভেরী অনেস্ট ইন্ দিস রেসপেক্ট হোয়াইল আদারস্ আর নট্।

সুনীল সেন অনেকক্ষণ চুপ করে শুনেছেন। আর পারলেন না। জিজ্ঞাসা করলেন, কিন্তু ঐটা কার জাজমেণ্ট তা ত বললেন না।

একটু বিরক্ত হয়েই সূর্যদা বললেন, ওরে বাপু, ওয়ারেন হেস্টিংসের ইম্‌পিচমিণ্টের সময় বার্ক ঐ কথা বলেছিলেন।

আপনি যদি রোজ দুটো-একটা কোটেশন মুখস্থ করে এসে এখানে ফড়ফড় করেন তাহলে আমরা কি করতে পারি?

সুনীল সেনের মন্তব্যে তারাবাবুর গা জ্বালা করে। বললেন,

আচ্ছা সূর্যদা, এই মন্তব্য করার পরও সুনীল আপনার শিষ্য থাকতে পারে ?

সূর্যদা গম্ভীর হয়ে বললেন, তোমার মত বোকা শিষ্যকে যদি বরদাস্ত করতে পারি, তাহলে বাচাল সুনীলকেও সহ্য করতে পারব।

তারাবাবু স্তম্ভিত, আমি বোকা ?

তবে কী ?

এই যে কাল বললেন আমার মত বুদ্ধিমান ছেলে······

কাল বুদ্ধিমান ছিলে বলে যে আজও বুদ্ধিমান থাকবে, তার কি মানে আছে ?

ভাল উকিল হয়েও তারাবাবু সূর্যদার যুক্তি বোঝেন না। বলেন, কাল বুদ্ধিমান ছিলাম আর আজ বোকা হয়ে গেলাম ?

ক্লাস টু'তে ভাল রেজাল্ট করেছিল বলে কি ক্লাস থ্রী'তেও ভাল রেজাল্ট হবে ?

এবার ফটিকবাবু আর চুপ করে থাকতে পারেন না। বলেন, তারা, একে বলে সূর্যদা! এই বুদ্ধি না থাকলে শ' পাঁচেক রেপ কেসে একটাও কনভিকশন হয় না, এমনি এমনি ?

শুনেই সুনীল সেন লাফিয়ে ওঠেন, আচ্ছা সূর্যদা, শ' পাঁচেক রেপ কেসের একটাতেও কনভিকশন হয়নি ?

সূর্যদা না ভেবেই বললেন, চার শ' একানব্বইটা রেপ কেসের মামলা লড়েছি আর তার মধ্যে সতেরটা কেসে কনভিকশন হয়েছে।

মাই গড! সুনীল সেন অত্যন্ত আক্ষেপ করে বললেন, এ খবর আগে জানলে···

সূর্যদা হেসে উঠলেন। বললেন, সেসন জজ বার্জম্যান কোর্টের মধ্যে বলেছিলেন, সূর্য, তোমার মত উকিল ইণ্ডিয়াতে আছে জানলে অনেক সাহেবই স্ত্রীকে ইংল্যাণ্ডে রেখে আসতেন।

এই আড্ডার মেয়াদ। এর পর এ আড্ডাখানায় ভাঙন ধরে

ফটিকবাবু বা তারাবাবুর মত উকিলদের নিত্যই কোন না কোন মামলার শুনানী থাকে। অন্যান্যদের রোজ না থাকলেও দু'একদিন পর পরই থাকে। অনেকের মামলা না থাকলেও এ আড্ডাখানা থেকে উঠে যান শিকারের সন্ধানে। হাতে মামলা না থাকলেও কর্মব্যস্ততার ভান করে সূর্যদার দরবার ছেড়ে উঠে যান কিছু উকিলবাবু। এখনও উঠে যাবার সময় হয়নি বলে আড্ডা চলে।

হাজার হোক এখানে সবাই উকিল। কোন পয়েন্ট হারিয়ে যাবার উপায় নেই। কোন একজনের মনে পড়বেই। সুভাষবাবু বললেন, সূর্যদা, আজেবাজে কথার ভিড়ে আসল কথাটাই চাপা পড়ল।

আমি ত চাপা দিতে চাইনি। আমি ত বলেছি ইম্পসিবল টু বী সাইলেণ্ট।

কিন্তু ডিফিকাণ্ট টু স্পীক কেন, সেটা বলুন।

শুনতে চাও?

অফ কোর্স! সুভাষবাবু হাত নেড়ে বললেন, সূর্যদা উবাচ! সবাই চুপ!

সূর্যদা সিগরেট ধরালেন। সঙ্গে সঙ্গে সুভাষবাবু হাত পাতলেন। সূর্যদা রেগে বললেন, রেপ কেসের গল্প শুনবে আবার সিগরেটও নেবে, তা হবে না।

সুভাষবাবু চিৎকার করে উঠলেন, সূর্যদার রেপ! সবাই চুপ।

তারাবাবু হাসতে হাসতে বললেন, সূর্যদার রেপ। সূর্যদা রেপ করেছেন নাকি সূর্যদাকে রেপ করেছে?

তান্ত্রিক সাধকদের মত বজ্র কঠোর দৃষ্টিতে একবার তারাবাবুর দিকে তাকিয়েই সূর্যদা হেসে বললেন, অনেক দিন পরে আবার একটা রেপ কেস পেয়েছি অ্যাণ্ড ভেরি ইণ্টারেস্টিং কেস টু।

সুনীল সেন হাসতে হাসতে বললেন, বলুন সূর্যদা, বলুন। এইসব ধর্ষণ-টর্সনের মামলা লড়ব বলেই ত উকিল হয়েছিলাম।

সূর্যদার প্রাইভেট সেক্রেটারী সুভাষবাবু আবার গর্জে উঠলেন, সাইলেন্স প্লীজ।

এবার সবাই চুপ।

সূর্যদা হেসে বললেন, কাল রাত্রে তিরিশ-বত্রিশ বছরের একটা মাগী এসে আমাকে বললো, তাকে একটা লোক রেপ করেছে বলে সে মামলা লড়বে এবং সঙ্গে সঙ্গে আমার টেবিলে একশ' টাকার ছুটো নোট রাখল।

কে যেন জানতে চাইলেন, মাগী কত রাত্রে এসেছিল? ওপাশের টেবিল থেকে আরেকজন প্রশ্ন করলেন, মাগীটাকে দেখতে কেমন সূর্যদা?

ডাগর-ডোগর মাগী একেবারে মুড হয়ে রাত বারোটার সময় এসেছিল। আর কিছু জানতে চাও?

ফটিকবাবু গম্ভীর হবার চেষ্টা করলেও হাসি ফুটে ওঠে সারা মুখে। বললেন, আবার আপনি ওদের কথায় কান দিচ্ছেন?

সূর্যদার বিরক্তি ভাব কেটে আবার সারা মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বললেন, আমি হতভাগীকে জিজ্ঞাসা করলাম, সত্যি মামলা লড়বে?

হতভাগী জবাব দিল, হ্যাঁ।

তোমার বিয়ে হয়েছে?

না।

কোন পুরুষের সঙ্গে ঘর করেছ?

ভাগীরথের সঙ্গে মাস তিনেক থাকার পরই আমার ঝগড়া হয়।

তারপর?

তারপর থেকে ত এই হতভাগার সঙ্গেই আমার ভাব হয়।

ভাব হয় মানে?

ছ'একদিন পর পরই আমার কাছে এসে রাত কাটাত।

তারপর ?

তারপর ভাগীরথ এসে খুব ধরাধরি করায় ঠিক করলাম ওকেই বিয়ে করব। হতভাগাকে আমি সেকথা বলেও দিলাম।

কি বললে ?

বললাম, পোড়ার মুখো, তুই আর আমার কাছে রাত কাটাতে আসবি না।

ও কী বলল ?

কিছুই বলেনি।

তারপর ?

তারপর হতভাগা আবার কাল রাত্রে এসে আর গেল না।

গেল না ?

না।

তুমি থাকতে দিলে ?

আমি দিতে চাইনি।

কেন ?

ভাগীরথ যদি জানতে পারে ? যদি ও টাকাকড়ি ফেরত চায়, তাহলে কী সর্বনাশ হবে বলুন ত ?

তাই তুমি মামলা লড়তে চাও ?

হ্যাঁ উকিলবাবু। মামলা না করলে ও আসা বন্ধ করবে না।

কিন্তু এ মামলায় তুমি জিততে পারবে না।

কিন্তু আপনিই বলুন বাবু, আমি যখন বারণ করেছি, তখন ও আসবে কেন ?

হয়ত তোমাকে ভালবাসে।

তা ত আমি জানি কিন্তু ভাগীরথ যদি জানতে পারে ?

ও যখন ভালবাসে তখন আসা বন্ধ করবে কেন ? তাছাড়া…

আমি ত একেবারে আসা বন্ধ করতে বলিনি। বলেছি, এতগুলো

টাকা যখন পাচ্ছি তখন বিয়েটা হয়ে যাক। তারপর ভাগীরথ যখনই সাহেবগঞ্জ যাবে, তখনই যেন ও আসে।

সূর্যদা এইটুকু বলেই থামলেন।

সুনীল সেন সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন, সেই দু'শ টাকা কি ফেরত দিলেন ?

ভয় নেই, মাগীকে তোমার কাছেই পাঠিয়েছি। আজ রাত্রে তুমি রেডি হয়ে থেকো।

ফটিকবাবু, তারাবাবু ও আরো কিছু উকিলবাবু আর বসতে পারলেন না। ওদের মামলার হিয়ারিং-এর সময় হয়ে গেছে।

সূর্যের মত সূর্যদাকে কখনও একা থাকতে হয় না। দু'চারটি উপগ্রহ সব সময়ই আশেপাশে থাকে। তারা বকবক করে। সূর্যদা পাশে বসে থেকেও যেন কারুর কোন কথা শুনতে পান না। মনে হয়, উনি যেন আবার স্মৃতির অরণ্যে পথ হারিয়েছেন। হঠাৎ কিছুক্ষণ পরে উনি আপন মনে বলে উঠলেন—

নিজেরে করিতে গৌরব দান
নিজেরে কেবলি করি অপমান,
আপনারে শুধু ঘেরিয়া ঘেরিয়া
ঘুরে মরি পলে পলে।

সুনীল সেন বললেন, একথা কেন বলছেন সূর্যদা ? এক কালে ত আপনি সত্যিই অনেক কিছু করেছেন। আর আমরা ? আমরা ত কলেজ থেকে বেরিয়েই কালো কোট চড়িয়ে শুধু মক্কেল ঠকাচ্ছি।

সত্যি, সূর্যদা কলেজ থেকে বেরিয়েই গায়ে কালো কোট চড়িয়ে সোজা কোর্টে আসেননি। অনেক অলি-গলি, রাজপথ-জনপথ, বহু

নদীনালা-খালবিল পার হয়ে উনি শেষ পর্যন্ত এই কোর্টে এসে হাজির হয়েছেন।

বিদ্যাসুন্দরের স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস করে কলকাতার রিপন কলেজে ভরতি হলেন। থাকেন কলেজেরই হস্টেলে। সূর্যকান্ত আপন মনে লেখাপড়া করেন আর বিকেলের দিকে কলেজ স্কোয়ার বেড়াতে যান। কোন কোনদিন ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে বা শ্রদ্ধানন্দ পার্কের সভায় বক্তৃতা শোনেন। শখের মধ্যে মাঝে-মাঝে দানীবাবু বা শিশির ভাদুড়ীর থিয়েটার দেখেন। এইভাবেই ক'টা মাস কেটে গেল। পূজার ছুটি এল, গেল। কলেজ খুলল। সূর্যকান্ত কলেজে যান, ক্লাস করেন, হস্টেলে ফিরে চা-টোস্ট খেয়েই বেড়াতে যান।

সেদিনও গিয়েছেন।

নমস্কার! আমি সুধীর সরকার। আপনার সঙ্গেই রিপন কলেজে পড়ি।

হ্যাঁ। হ্যাঁ। আপনাকে দেখেছি। আমার নাম সূর্যকান্ত···

চৌধুরী।

সূর্যকান্ত অবাক হয়ে বললেন, আপনি তাও জানেন?

আলাপ না হলেও আপনাকে আমার ভাল লেগেছে। তাই···

কেন? ভাল লাগার মত ত আমার কিছু নেই।

আছে বৈকি। তা না হলে ভাল লাগে?

সূর্যকান্ত হেসে বললেন, আপনি আমাকে অবাক করলেন সুধীরবাবু।

সুধীরবাবু গম্ভীর হয়ে বললেন, আপনি যে অধিকাংশ ছাত্রদের মত আনন্দের জোয়ারে ভেসে যান না, তাই দেখেই আমার ভাল লেগেছে।

সূর্যকান্ত চুপ করে থাকেন।

দেখুন সূর্যবাবু, হাজার হোক দেশের অবস্থা বিশেষ ভাল না।

ক'বছরের মধ্যে দেশের পরিস্থিতি কত পালটে গেল। কত হাজার ছেলেমেয়ে জেলে গেল, কতজনে ফাঁসিতে ঝুলল…

আপনি কি রাজনীতি করেন সুধীরবাবু? একটু ঘাবড়ে গিয়েই সূর্যকান্ত প্রশ্ন করেন।

না, না, রাজনীতি করি না। তবে দেশের কথা ভাবি। আপনিই বলুন, দেশের কথা ভাবার সময় কি আমাদের আসেনি?

তা ত এসেছে।

আপনিও ভাবেন নাকি?

ঠিক আপনার মত ভাবি না কিন্তু…

একটু ভাববেন।

নিশ্চয়ই।

সেদিন আর কথা হয় না কিন্তু দু'তিন দিন পরেই হঠাৎ দুজনের দেখা হয় কলেজের সিঁড়িতে। সুধীরবাবু হাসতে হাসতে ওকে জিজ্ঞাসা করেন, কী খবর সূর্যবাবু? কেমন আছেন?

ভাল। আপনি কেমন আছেন?

বিশেষ ভাল না।

কেন? শরীর খারাপ হয়েছে নাকি?

সুধীরবাবু হেসে বলেন, আমরা শরীর খারাপ হতে দিই না।

সূর্যবাবু অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে বলেন, শরীর খারাপ হতে দিই না মানে?

হ্যাঁ সূর্যবাবু, আমাদের শরীর খারাপ হলে চলে না। শরীর ঠিক না রাখলে কাজকর্ম করব কী ভাবে?

সুধীরবাবুর কথা শুনে সূর্যবাবু একটু অবাক হন কিন্তু মুখে প্রকাশ করেন না। প্রশ্ন করলেন, ক্লাশ শেষ?

না; তবে আর ক্লাশ করব না। একটু কাজে বেরুচ্ছি।

আচ্ছা যান।

সুধীরবাবু এক পা এগিয়েই আবার ফিরে এসে ওকে জিজ্ঞাসা করেন, রোজ শ্রদ্ধানন্দ পার্কে বেড়াতে যাচ্ছেন ?

হ্যাঁ।

পরশু সাড়ে পাঁচটা নাগাদ আসব। থাকবেন।

থাকব।

সুধীরবাবু আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা না করে হন হন করে চলে যান।

উনি চলে যাবার পরও সূর্যকান্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকেন। সুধীরবাবুর কথা ভাবেন। কলেজে মাত্র এক বছরের সিনিয়র কিন্তু ওর হাবভাব, চাল-চলন যেন ঠিক আর পাঁচজন ছাত্রদের মত নয়। সব সময়ই কি যেন ভাবছেন, সব সময়ই যেন ব্যস্ত। হঠাৎ মনে হবে, ওর অনেক কাজ, অনেক দায়িত্ব কিন্তু……ঘণ্টা পড়তেই সূর্যকান্ত চমকে ওঠেন। প্রায় লাফিয়ে লাফিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠে ক্লাশে যান।

দু'দিন পর ঠিক সাড়ে পাঁচটায় সুধীরবাবু শ্রদ্ধানন্দ পার্কে এসে হাজির। ওকে দেখেই সূর্যকান্ত হাসি মুখে এগিয়ে যান।

সুধীরবাবু সূর্যকান্তকে টেনে নিয়ে একটু ফাঁকা জায়গায় বসেন। তারপর একটু এদিক-ওদিক তাকিয়ে নিয়ে বলেন, আপনি তো এখানে নিয়মিত বেড়াতে আসেন ; কোনদিন সুভাষবাবুর বক্তৃতা শুনেছেন ?

একদিন শুনেছি।

মাত্র একদিন ?

হ্যাঁ।

মাত্র একদিন কেন ?

রাজনীতিতে আমার বিশেষ আগ্রহ নেই। তাছাড়া ওঁর বক্তৃতা শুনতে গেলে হস্টেলে ফিরতে দেরী হয়ে যাবে বলে চলে যাই।

তবুও শুনবেন। বোধহয় ভাল লাগবে।

সুভাষবাবু সত্যি ভাল বলেন তবে……। সূর্যকান্ত কথাটা শেষ শেষ করেন না।

সুধীরবাবু প্রশ্ন করেন, তবে কী ?

সূর্যকান্ত বলেন, সুভাষবাবুর কথা মত তো কাজ করতে পারব না ; তাই……

কাজ করতে না পারলেও অত বড় নেতার কথা শুনতে আপত্তি কী ?

না, না, আপত্তি কী ? সময় সুযোগ হলে নিশ্চয়ই শুনব।

একটু কষ্ট করেও সময় সুযোগ করে নেবেন। এবার সুধীরবাবু ওকে জিজ্ঞাসা করেন, আপনি কী নিয়ে পড়ছেন ?

আমি ইংরাজী নিয়ে পড়ছি।

পড়ুন তবে ইতিহাসও পড়বেন।

ইতিহাস বিশেষ ভাল লাগে না।

ভাল না লাগলেও ইতিহাসকে জানা দরকার।

তা ঠিক।

আরো কিছুক্ষণ টুকটাক কথাবার্তা বলার পর সুধীরবাবু একবার চার পাশ দেখে নিয়ে ওর কানে কানে ফিসফিস করে বললেন, একটা বই পড়বেন ?

কোন্ বই ?

পথের দাবী।

কার লেখা ?

শরৎ চাটুজ্যের।

সূর্যকান্ত একটু অবাক হয়ে বললেন, কিন্তু সে বই সরকার বাজেয়াপ্ত করে নিয়েছেন।

বইটা আপনি পড়েছেন ?

না।

পড়বেন ?

পড়তে ত চাই কিন্তু…

সুধীরবাবু মলাট দেওয়া একখানা বই এগিয়ে দিয়ে বললেন, এই

নিন। একটু সাবধানে পড়বেন।

মনে মনে একটু ভয় করলেও সূর্যকান্ত বইখানা নিলেন।

দিন তিনেক পরে কলেজ স্কোয়ারে বেড়াতে গিয়েই সূর্যকান্ত সুধীরবাবুকে বইখানা ফেরত দিলেন।

কেমন লাগল সূর্যবাবু ?

ভাল, খুব ভাল কিন্তু···

কিন্তু কি ?

সব্যসাচীর পথ বোধ হয় আমাদের দেশের পক্ষে ঠিক নয়।

কেন ?

এত বড় ইংরেজ শক্তির বিরুদ্ধে এই ধরনের কোন প্রচেষ্টা কখনই সাকসেসফুল হতে পারে না।

দেখুন সূর্যবাবু, আসল কথা হচ্ছে দেশের স্বাধীনতা। সেই স্বাধীনতার জন্য ইতিমধ্যেই সর্বভারতীয় আন্দোলন গড়ে উঠেছে এবং গান্ধীজীর নেতৃত্বে গড়ে ওঠা এই আন্দোলনের জন্য ইংরেজরা নিশ্চয়ই চিন্তিত।

তা ত বটেই।

এই পটভূমিকায় যদি কোন গোষ্ঠী যে কোন উপায়ে কিছু বাছাই করা অত্যাচারী ইংরেজ শাসককে এই পৃথিবী থেকে চিরদিনের মত সরিয়ে দিতে পারে তাহলে···

কিন্তু···

সুধীরবাবু হেসে বললেন, এ কাজে অনেক কিন্তু আছে ঠিকই। তবে করতে পারলে ইংরেজ আতঙ্কিত না হয়ে পারবে না।

তা ঠিক।

মাস খানেক যেতে না যেতেই সূর্যকান্ত পটুয়াটোলার এক ভাঙা বাড়ির প্রায়ান্ধকার ঘরে নতুন মন্ত্রে দীক্ষিত হলেন।

দুই

হঠাৎ সব কিছু বদলে গেল। চোখের দৃষ্টি, মনের স্বপ্ন, জীবনের ধারা। সবকিছু। ভোরবেলায় উঠে হস্টেলের ছাদে ব্যায়াম করতে গিয়ে সূর্যকান্ত প্রাণ ভরে নিশ্বাস নিতে পারে না। বাতাস দূষিত মনে হয়। পরাধীন দেশের বাতাস নিঃশ্বাসে-প্রশ্বাসে বুকের মধ্যে গিয়ে যেন হৃৎপিণ্ডকে ক্ষত-বিক্ষত করছে, বিষ ছড়িয়ে দিচ্ছে রক্তের ধারায়, দেহের প্রতিটি অণু-পরমাণুতে।

কলেজে ক্লাস না থাকলেও হস্টেলে ঘুমিয়ে সময় কাটান না। কাটাতে পারেন না। সময়ের অপব্যয় অসহ্য মনে হয়। সূর্যকান্ত নিজের ঘরে বসে পড়েন ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস, চতুর্দশ লুই-এর ব্যভিচার, অক্টোবর বিপ্লবের কাহিনী, রাশিয়ার জার সম্রাট দ্বিতীয় নিকোলাসের বীভৎস অত্যাচারের বিবরণ। আরো পড়েন আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসে; জেফারসন ও জর্জ ওয়াশিংটনের জীবনী। লর্ড কর্ণওয়ালিশের পরাজয়ের কাহিনী পড়তে পড়তে নতুন আশার আলো দেখেন সূর্যকান্ত।

ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে করতে সূর্যকান্ত গায়ত্রীর মত জপ করেন, মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই।···ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, বার্ধক্যের বারাণসী; বল ভাই ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ।

কলেজের বা হস্টেলের কেউ কিছু জানতে পারেন না, বুঝতে পারেন না সূর্যকান্ত বইখাতা হাতে করে কোথায় যান, কেন যান। পর পর ক'দিন ফিরতে বেশ রাত হবার পরই হস্টেল সুপারিনটেনডেণ্ট কৈফিয়ত তলব করলেন, তোমার ফিরতে আজকাল রাত হচ্ছে কেন?

স্যার, পড়তে যাই।

কোথায়?

আমার এক আত্মীয়ের কাছে।

তিনি কি কলেজে পড়ান?

হ্যাঁ স্যার।

কলেজের বার্ষিক পরীক্ষায় সূর্যকান্ত অত্যন্ত ভাল নম্বর পেয়েছেন। সুপারিনটেনডেণ্ট আর কিছু বলতে পারেন না। শুধু সতর্ক করে দেন, দেখো, আজেবাজে ছেলের পাল্লায় পড়ো না।

না স্যার, আমি কোন বাজে ছেলের সঙ্গে মিশি না।

তা আমি জানি।

লোকচক্ষুর আড়ালে সূর্যকান্তর সাধনা এগিয়ে চলে। তারপর হঠাৎ একদিন হোয়াইটওয়ে লেডল'র দোকানের মধ্যে বোমা ফাটতে তিনজন ইংরেজ আই-সি-এস একসঙ্গে আহত হওয়ায় হৈ চৈ পড়ে গেল সারা শহরে। ঠিক দু'দিন পরেই ভোরবেলায় পুলিস রিপন হস্টেল থেকে সূর্যকান্তকে লালবাজার নিয়ে গেল।

সেদিনের কাহিনী বলতে গিয়ে সূর্যদা হাসতে হাসতে আমাকে বললেন, তখন আমার মোটে সতের বছর বয়স। পুরো আটচল্লিশ ঘণ্টা আমাকে কিছু না খেতে দিয়েই জেরা করল কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওরাই হাঁপিয়ে উঠে আমাকে ছেড়ে দিল।

আমি বললাম, জেরা করে কিছু বের করতে না পারলেও ওরা ত

ঠিক আপনাকে ধরেছিল।

হাজার হোক ক্যালকাটা পুলিস। পলিটিক্যাল ব্যাপারে ওরা বিশেষ ভুল করে না।

তারপর কি হলো ?

পুলিসের হাত থেকে ছাড়া পেলেও পুলিসের খাতায় ত নাম উঠে গেল। তাই আরো গোপনে, আরো সতর্ক হয়ে কাজ করতে শুরু করলাম।

এবার আর পটুয়াটোলা নয়, সূর্যকান্ত দু'একদিন পর পরই দক্ষিণেশ্বর—বেলুড় মঠ যাওয়া শুরু করলেন। সুধীর সরকার বা প্রদীপ গুহ কীর্তনের আসরেই ওকে কাজকর্মের কথা জানিয়ে দেন। তবে সামনে আই-এ পরীক্ষা বলে খুব বেশী সময় দেন না। ফার্স্ট ডিভিসনে আই-এ পাস করে সূর্যকান্ত সবাইকে খুশী করলেন। হস্টেল সুপারিনটেনডেণ্ট বললেন, আমি জানতাম তুমি পলিটিকস করার মত ছেলে না।

বি-এ ক্লাসে ভরতি হয়েই সূর্যকান্ত পাগলের মত মেতে উঠলেন।

সেদিন সন্ধ্যেবেলায় মেছুয়াবাজারের মেসে যেতেই নলিনীদা বললেন, সূর্য, একটা কাজ করতে পারবে ?

সূর্যকান্ত বললেন, আপনি বললে নিশ্চয়ই পারব।

একটু কঠিন কাজ। তবে সুভাষবাবু বলছিলেন, তুমি আর শেখর এই কাজটা করলেই ভাল হয়।

উনি যখন বলেছেন তখন আর আমার মতামত জানতে চাইছেন কেন ?

শেখর আজ কলকাতার বাইরে। কাল সকালেই ফিরবে। নলিনীদা মুহূর্তের জন্য কি যেন একটু ভেবে বললেন, তুমি কাল সন্ধ্যে সাড়ে ছ'টায় কালীঘাট মন্দিরের দক্ষিণ দিকের গেটের সামনে থেকো।

থাকব।

সূর্যকান্ত পরের দিন সন্ধ্যে সাড়ে ছ'টায় ওখানে হাজির হতেই সারদা পিসী ডাকলেন, সূর্য, আমাকে একটু বাড়ি পৌঁছে দিবি বাবা ?

পিসী, তুমি হুকুম করলে ঐ সামনের হাঁড়ি কাঠে গলা দিয়েও···

পোড়ারমুখো, এই ভর সন্ধ্যেবেলায় আজেবাজে কথা বললে এক থাপ্পড় খাবি।

কালীঘাট মন্দিরের কাছেই সারদা পিসীর বাড়ি। পৌঁছতে পাঁচ মিনিটও লাগল না। দু'এক মিনিটের আগে পরেই নলিনীদা আর শেখরদা এলেন। নলিনীদা দুজনকে সবকিছু ভালভাবে বুঝিয়ে দিয়ে বললেন, বিপদের থেকে রক্ষা পাবার জন্য পিসী সবকিছু দিয়ে দেবেন।

নলিনীদা সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আমাকে এলগিন রোড যেতে হবে। আমি চললাম।

নলিনীদা চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই পিসী ভীম নাগের সন্দেশের দুটো বড় বড় বাক্স ওদের সামনে রেখে বললেন, একবার দেখে নে।

দুজনে দেখল, হ্যাঁ, রিভলবার আর কার্তুজ ঠিকই আছে।

ঠিক আছে ত ?

শেখরবাবু বললেন, হ্যাঁ পিসী, ঠিক আছে।

তোরা আর দেরি করিস না। কান্তি তোদের জামা-কাপড় নিয়ে অপেক্ষা করছে। ওরা দুজনে উঠে দাঁড়াতেই পিসী বললেন, মা কালীর ফটোয় প্রণাম কর। দেখিস, কোন বিপদে পড়বি না।

শুধু মা কালীর ফটোতে নয়, পিসীকেও ওরা প্রণাম করে বেরিয়ে পড়ল। রিকশা করে কান্তির বাসায় পৌঁছতে প্রায় ঘণ্টাখানেক লেগে গেল। খাওয়া-দাওয়া সেরে পুলিসের পোশাক পরে ওরা যখন বেরিয়ে এলো, তখন ন'টা বেজে গেছে। সেখান থেকে আউট্রাম ঘাট। গঙ্গার ধার দিয়ে খানিকটা হাঁটতেই ভাটিয়ালী গান শুনতে

গেল। আর একটু এগুতেই আসলাম মাঝি ডাকল, যে? রহমন সাহেব নাকি?

শেখরবাবু বললেন, হ্যাঁ। আসলাম নাকি?

হ্যাঁ কত্তা!

সঙ্গে সঙ্গে ওরা দুজনে তরতর করে নীচে নেমে আসলামের নৌকোয় চড়লেন।

প্রথমে গঙ্গা পার। তারপর ভাঁটার টানে বেশ কিছুদুর যাবার পরই জাহাজের আলোগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠল। তারপর আরো স্পষ্ট। আর একটু এগুতেই জাহাজের নামগুলোও বেশ পরিষ্কার নজরে পড়ল।

শেখরবাবু বললেন, আসলামদা, আশেপাশে নজর রেখো।

আমি ঠিকই নজর রেখেছি কিন্তু তোমরা এবার গুলী ভরে নাও।

সূর্যকান্ত জিজ্ঞাসা করল, এখনই?

আসলাম বললেন, নিশ্চয়ই।

এক মিনিটের মধ্যে কার্তুজ ভরে ওরা প্রস্তুত হলেন। সঙ্গে সঙ্গে আসলাম বললেন, সামনের জাহাজটাই বোধহয় জার্মানীর হবে।

অত্যন্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে ওরা দুজনে দেখেই বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঐটাই।

লাইফ বোটের সঙ্গে কিছু ঝুলছে?

শেখরবাবু বললেন, না, কিছু ত দেখছি না।

কালো রংয়ের বাক্স হবে। তাই বোধহয় দেখতে পাচ্ছো না। টর্চটা একবার আমাকে দাও।

সূর্যকান্ত আসলামের হাতে টর্চ দিয়ে শেখরবাবুর পাশে এসে বসতেই পাশের জাহাজ থেকে একটা বিকট চিৎকার শোনা গেল।

আসলাম বললেন, এই জাহাজ পুলিস সার্চ করছে।

এই জাহাজটা পাশ কাটিয়ে একটু এগুতেই আসলাম মুহূর্তের

জন্য টর্চ জ্বেলেই বললেন, এটাই জার্মান জাহাজ। আমি লাইফ বোটের তলায় নৌকো নিচ্ছি। তোমরা খুব চটপট বাক্সটা ধরে নৌকোর ভিতরে রেখে দিও।

শেখরবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, কিন্তু ওরা ঠিক মত নামিয়ে দেবে ত ?

নিশ্চয়ই দেবে।

সূর্যকান্ত বললেন, ওদের কাউকে ত দেখতে পাচ্ছি না।

আসলাম হেসে বললেন, লাইফ বোটের মধ্যে লুকিয়ে বসে থাকলে দেখবে কেমন করে ?

সত্যি লাইফবোটের তলায় নৌকো যাবার সঙ্গে সঙ্গেই কালো বাক্সটা নেমে এলো। শেখরবাবু আর সূর্যকান্ত আসলামের কথা মত বাক্সটাকে ধরে নিয়েই নৌকোর মধ্যে রেখে দিল।

মাঝ-গঙ্গা পার হয়ে যাবার পর পুলিস-লঞ্চের আলো পড়তেই আসলাম বললেন, তোমরা দুজনে এবার দাঁড়িয়ে থাকো। তোমাদের দেখলে ওরা আর সন্দেহ করবে না।

ছাউনির ভিতর থেকে বাইরে এসেই শেখরবাবু বললেন, আসলামদা, ল্যাম্বার্ট সাহেব লঞ্চে নেই ত ?

ও শালা থাকলেও মদ খেয়ে এখন বেহুঁশ হয়ে আছে।

না, কোন ঘটনা ঘটল না। শেষ পর্যন্ত নৌকা শিবপুরের এক ঘাটে ভিড়ল। শেখরবাবু আর সূর্যকান্ত পুলিসের পোষাক ছেড়ে প্যান্ট-শার্ট পরে ঘাটে নামলেন। শেখরবাবু বাক্স মাথায় নিলেন আর সূর্যকান্ত কার্তুজ ভরতি রিভলবার পকেটে নিয়ে পাশে পাশে এগুচ্ছেন। বড় রাস্তায় উঠলেই কার্তিকের মোটর সারাবার দোকান। সেখানে পৌছলেই এদের কাজ শেষ। তবে এই অলিগলির রাস্তাটুকু বিশেষ ভাল না। হিমাদ্রি এখানেই পুলিসের গুলিতে প্রাণ দেয়। শেখরবাবুর হাতেও গুলি লাগে কিন্তু বেঁচে যান। রাস্তাটা খারাপ হলেও কার্তিকের দোকানে যাবার আর কোন রাস্তা নেই।

শেখরবাবু বললেন, সূর্য, বড্ড অন্ধকার। একবার টর্চ জ্বেলে দেখবি নাকি ?

না শেখরদা, টর্চ জ্বাললে দূর থেকেও বুঝতে পারবে।

কিন্তু হঠাৎ যদি সামনা-সামনি দেখা হয়ে যায় ?

তাহলে ত পিসীমা আছেনই।

অনেক বছর আগেকার কাহিনী। এতদিন পরে বলতে গিয়েও সূর্যদা কেমন যেন আনমনা হয়ে গেলেন। ওর ভাবগম্ভীর দুটো চোখ ক্লান্ত বিষণ্ণ হয়ে দূরের আকাশের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। তারপর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, শেখরদার কথাই ঠিক হলো। প্রায় সামনা-সামনিই দেখা হলো।

আমি উৎকণ্ঠিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, পুলিস ?

হ্যাঁ।

তারপর ?

একসঙ্গেই দুদিক থেকে গুলি চলল।

বলতেও যেন সূর্যদার কষ্ট হচ্ছে। একটু থামলেন। আমি শুনেই উত্তেজিত হই। জিজ্ঞাসা করি, তারপর ?

অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ইন্সপেক্টর জলি আর শেখরদা একসঙ্গেই মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন।

তারপর ?

গুলির আওয়াজ শুনেই আসলামদা দৌড়ে এসে দুজনকেই টানতে টানতে টানতে নিয়ে গেলেন।

আপনি ?

আমি শেষ পর্যন্ত ঐ কালো বাক্স নিয়ে কার্তিকদার দোকানে পৌঁছেছিলাম।

পুলিস দেখতে পায়নি ?

না, ইন্সপেক্টর জলি একলাই নদীর ঘাট দেখতে এসেছিল। ওর সঙ্গীরা অনেক দূরে ছিল। ওরা এসে পৌঁছবার আগেই আমি সরে পড়েছিলাম।

আর আসলাম ওদের দুজনকে নিয়ে কি করলেন ?

দুজনেই মারা গিয়েছিলেন।

মারা গিয়েছিলেন ?

হ্যাঁ।

ভাবলাম, জিজ্ঞাসা করি ওদের ডেডবডি নিয়ে আসলাম কি করলেন কিন্তু সূর্যদার মুখের দিকে তাকিয়ে পারলাম না।

শেখরবাবুর মৃত্যুর খবর শুনে নলিনীদা ঘণ্টা খানেক কারুর সঙ্গে কথা বলতে পারলেন না। পিসী বললেন, যমের ঘর থেকে কি বার বার ঘুরে আসা যায় ?

পরের দিন বিকেলে হস্টেল থেকে বেরুতেই একজন ভিখারী ইশারা করে সূর্যকান্তকে কাছে ডাকল। সূর্যকান্ত ভাবলেন, বোধহয় পুলিসের চর কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওর কাছে না গিয়ে পারলেন না।

চিনতে পারছিস ?

সূর্যকান্ত খুব ভালভাবে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, আসলামদা ?

চুপ!

তুমি এখানে ?

নলিনীদা পাঠালেন। তুই এখুনি পিসীর কাছে চলে যা। সেখান থেকে আজ রাত্রেই···।

আসলাম কথাটা শেষ না করেই চোখের ইশারায় বুঝিয়ে দিলেন পালাতে হবে।

আমি তাহলে একবার আমার ঘর থেকে ঘুরে আসি।

আবার ঘরে যাবি কেন?

কিছু কাগজপত্র আর পিসীমা আছে যে।

খুব তাড়াতাড়ি করিস।

কাগজপত্র আর রিভলবার পিসীমার কাছে রেখে চন্দননগর রওনা হবার পথে হাওড়া স্টেশনেই সূর্যকান্ত পুলিসের হাতে ধরা পড়লেন। পুলিস কাস্টডি থেকে দমদম সেন্ট্রাল জেলে যাবার ক'দিন পরেই আসলামও হাজির।

সূর্যকান্ত অবাক, আসলামদা, তুমিও ধরা পড়লে?

আসলাম হেসে বললেন, তাতে কি হয়েছে?

আর কেউ ধরা পড়েছে নাকি?

পটুয়াটোলার বাড়ি পুলিস সার্চ করেছে কিন্তু তখন কেউ ওখানে ছিলেন না।

কাগজপত্র মালমসলা?

সেসব আগেই সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল।

তুমি ধরা পড়লে কেমন করে?

আসলাম আবার হেসে বললেন, নলিনীদা ধরা দিতে বললেন।

কেন?

নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে।

মাস খানেক পরের কথা।

সূর্যদা একটু হেসে বললেন, আমাদের বহরমপুর জেলে নিয়ে যাবার সময় রাণাঘাট স্টেশন থেকে ট্রেন ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই একজন

প্রবীণ পুলিস ইন্সপেক্টর উঠলেন এবং আমাদের এসকর্টদের খুব বকুনি দিতে শুরু করলেন।

কেন?

আমাদের গাড়িতে অন্য প্যাসেঞ্জার ছিল বলে।

তারপর?

পরের স্টেশনেই সব প্যাসেঞ্জারদের নামিয়ে দেওয়া হলো। তারপর দুটো-একটা ছোটখাট স্টেশন পার হবার পরই আসলামদা কনুই দিয়ে আমাকে একটা গুঁতো মেরেই চোখ টিপলেন। দমদম জেল থেকে রওনা হবার আগে বিশেষ কথা বলার সুযোগ না থাকলেও উনি বলেছিলেন, রাণাঘাটের পর যেন একটু সতর্ক থাকি। কনুইয়ের গুঁতো খেয়ে কথাটা মনে পড়ে গেল।

সূর্যদা এক গাল হাসি হেসে বললেন, মিশরের মমির মত আজ সূর্যকান্ত চৌধুরীর শুধু দেহটাই আছে, প্রাণ নেই কিন্তু একদিন ছিল।

আমি বললাম, এসব কথা পরে শুনব। তারপর কি হলো আগে বলুন।

সূর্যদা আবার শুরু করলেন, একটা ছোট্ট স্টেশনে গাড়ি দাঁড়াল। তখন অনেক রাত। প্ল্যাটফর্মে বিশেষ লোকজনও ছিল না। টিম টিম করে কয়েকটা কেরোসিনের আলো জ্বলছিল। হঠাৎ প্ল্যাটফর্মে বোমা ফাটার আওয়াজ হতেই ইন্সপেক্টর সাহেব বিকট চিৎকার করে আমাদের এসকর্ট পার্টিকে বললেন, চট করে নীচে নেমে দেখো কোন সর্বনাশ হলো কিনা।

তারপর?

সঙ্গে সঙ্গে এসকর্ট পার্টি প্ল্যাটফর্মে নামল। ইতিমধ্যে গাড়ি ছেড়ে দিয়েছে। ইন্সপেক্টর সাহেব আমাদের কম্পার্টমেণ্টের দরজায় দাঁড়িয়ে চিৎকার করে ওদের বললেন, না, না, বোধহয় কিছু হয়নি। তোমরা সামনের গাড়িতেই উঠে পড়। মুহূর্তের মধ্যে নলিনীদা

আমাদের হাতকড়া খুলে দিয়েই…

নলিনীদা ?

হ্যাঁ, নলিনীদাই ইন্সপেক্টর সেজে রাণাঘাটে…

কি আশ্চর্য !

হাতকড়া খুলতেই নলিনীদার সঙ্গে সঙ্গে আমরাও ঝপাঝপ চলন্ত ট্রেন থেকে লাফিয়ে পড়লাম।

পুলিসের সঙ্গে আরো দু'একবার লুকোচুরি খেললেও সূর্যকান্তকে উঁচু পাঁচিল দেওয়া সরকারী অতিথিশালায় সাত বছর কাটাতে হয়েছে। জেলে থাকতে থাকতেই বি-এ পরীক্ষা দিলেন। ইংরেজিতে অনার্স নিয়েই পাস করলেন।

আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলের ইংরেজ জেলর মেজর হাওয়ার্ড নিজে খবরটা পৌঁছে দিয়ে সূর্যকান্তকে বলেছিলেন, আগে আমার ধারণা ছিল আনকালচার্ড, ব্রুট, হুলিগানসরাই বোমাবাজি করে, কিন্তু জেলে কাজ করে দেখছি ব্রিলিয়াণ্ট ছেলেরাই পলিটিক্যাল মুভমেণ্ট চালাচ্ছে।

সূর্যকান্ত বললেন, মেনি থ্যাঙ্কস ফর ইওর কমপ্লিমেণ্টস ।

মেজর হাওয়ার্ড মাথা দোলাতে দোলাতে বললেন, আমি পলিটিক্স বুঝি না ; তবে মনে হয় টু-ডে অর টু-মরো আমাদের এ দেশ ছাড়তেই হবে।

মেজর হাওয়ার্ড ইংল্যাণ্ডে ফিরে গিয়েও সূর্যকান্তকে ভুলতে পারেননি। বছরে দুটো-একটা চিঠি লিখতেনই। পরবর্তীকালে চিঠি না লিখলেও নিউ ইয়ার্সে কার্ড পাঠাতেন প্রত্যেক বছর। তারপর হঠাৎ একবার কার্ড এলো না কিন্তু তার পরের বছর মিসেস হাওয়ার্ডের কার্ডের তলায় মেজর সাহেবের নাম না দেখে বুঝলেন তিনি নেই।

মিসেস হাওয়ার্ডের কার্ড এখনও আসে। সূর্যকান্তও প্রতি বছর কার্ড পাঠান।

যাই হোক জেল থেকে ছাড়া পাবার পর সূর্যকান্ত চারদিকে অন্ধকার দেখলেন। সুভাষবাবু দেশ ছেড়ে চলে গিয়েছেন। নলিনীদা জেলে। সুধীরবাবু আন্দামানে। আসলামদার ফাঁসি হয়েছে। পিসীও নেই। পটুয়াটোলার ঐ বাড়িতে গিয়ে দেখলেন, নতুন ভাড়াটে এসেছেন। ওদিকে মাসীর বাড়িতে গিয়ে শুনলেন, বাবা নেই। ব্লাডপ্রেসারে মার হাঁটা-চলা প্রায় বন্ধ।

সূর্যকান্ত খুঁজে বেড়ান আরো অনেককে। পটুয়াটোলার মানিকদাকে, কেষ্টদাকে। মানিকতলায় সুধীরবাবুর বাসাতেও গেলেন। না, ওখানে ওদের বাড়ীর কেউই নেই। এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক পাশের বাড়ীর রকে বসে বসেই জিজ্ঞাসা করলেন, কাকে খুঁজছেন?

সূর্যকান্ত সুধীরবাবুর নাম করেন না। বলেন, এখানে নীলমাধববাবুরা থাকতেন। তারা কোথায় গিয়েছেন বলতে পারেন?

নীলমাধববাবু মানে ঐ বোমাবাজ ছোড়াটার বাপের কথা বলছ তো?

হ্যাঁ, মানে যিনি সুভাষবাবুর চেলা······

বুঝেছি, বুঝেছি······।

ওরা কোথায় গিয়েছেন?

আপনি কোথায় থাকেন?

কালীঘাট।

তা আপনি ওদের কে হন?

সূর্যকান্ত তাড়াতাড়ি ভেবে নিয়ে বললেন, নীলমাধববাবু আমার কাকার অফিসে কাজ করতেন।

তা ওরা তো বহুকাল এখানে নেই।

এখান থেকে ওরা কবে চলে গেছেন?

ওরা চলে যাবে কেন ? বাড়ীওয়ালা পুলিসের উৎপাত সহ্য করতে না পেরে বাপ বাপ বলে তাড়িয়ে ছেড়েছে।

অনেক অনুরোধ-উপরোধ, অনেক প্রশ্নের জবাব দেবার পর সূর্যকান্ত জানতে পারলেন, নীলমাধববাবু ওর ভাইয়ের বরানগরের বাড়ীতে চলে গেছেন।

বহু বছর আগে সূর্যকান্ত সুধীরবাবুর কাকার বরানগরের বাড়ীতে গেছেন। তাও একলা একলা যান নি। গিয়েছেন সুধীরবাবু বা মেজদির সঙ্গে। দু' একবার গীতার সঙ্গেও গিয়েছেন। তাই এত বছর পর সে বাড়ী খুঁজে বের করতে সূর্যকান্তকে বেশ বেগ পেতে হলো।

না, ওখানেও ওদের সঙ্গে দেখা হলো না। শুধু জানতে পারলেন মেজদির বিয়ে হয়ে গেছে। নীলমাধববাবু মারা গেছেন। কাটোয়ায় দেশের বাড়ীতেই নীলমাধববাবুর স্ত্রী আর ছোট মেয়ে থাকেন।

হ্যাঁ, কাটোয়ার গ্রামে গীতার সঙ্গেই প্রথম দেখা হলো।

সূর্যদা, তুমি ?

হ্যাঁ আমি।

কবে জেল থেকে ছাড়া পেলে ?

দিন দশেক আগে।

বাড়ী গিয়েছিলে ?

কাদের বাড়ী ?

তোমাদের বাড়ী।

হ্যাঁ, গিয়েছিলাম।

তাহলে সব খবরই পেয়েছ।

সূর্যকান্ত চুপ করে থাকেন।

গীতা প্রশ্ন করে, আমরা এখানে আছি জানলে কেমন করে ?

অনেক ঘুরে বরানগরে গিয়েছিলাম।

রাঙা কাকা তো বহুকাল ও বাড়ী বিক্রী করে হাজারিবাগ চলে গেছেন।

ওখানে গিয়েই জানতে পারলাম।

আমাদের খবরও ওখানেই পেয়েছ?

হ্যাঁ।

সূর্যকান্ত সুধীরবাবুর মাকে প্রণাম করতেই তিনি পাগলের মত কেঁদে উঠলেন। বললেন, বলতে পারিস সূর্য, কেন সবকিছু গণ্ডগোল হয়ে গেল? কী এমন অপরাধ করেছি যে আজ একলা একলা এভাবে ভিখারীর মত বিধবা মেয়েটাকে নিয়ে······

সূর্যকান্ত প্রায় চিৎকার করে ওঠেন, কে বিধবা? গীতা?

হ্যাঁ।

সূর্যকান্তর মাথাটা ঘুরে যায়। এই দুপুরের রোদ্দুরেই যেন অমাবস্যার অন্ধকার দেখেন চোখে। কত দিনের কত কথা এক সঙ্গে মনে পড়ে।···

জানো গীতা, তোমার দাদা আমাকে দলে টানার জন্য অনেক দিন ধরেই চেষ্টা করছেন কিন্তু আমি তত উৎসাহবোধ করি নি।

তাহলে কে তোমাকে পটুয়াটোলার আখড়ায় টেনে আনলো?

তুমি।

আমি?

হ্যাঁ, তুমি।

কেন? কীভাবে?

যেদিন দেখলাম তুমি নির্বিবাদে পটুয়াটোলা থেকে রিভলবার নিয়ে কালীঘাটে গেলে, সেদিনই মনে মনে ঠিক করলাম···

গীতা হাসতে হাসতে বলে, শাড়ীর মধ্যে লুকিয়ে একটা পিস্তল

নিয়ে যাওয়া এমন কি কঠিন কাজ!

সেদিন তোমার কাছে যা সহজ ছিল, আমার কাছে তা কল্পনাতীত ছিল।

এবার গীতা বলে, এখন তোমার কাছে যা সহজ, আমার কাছে তা কল্পনাতীত।

না, না, ঠিক বললে না। প্রয়োজন হলে তুমি সবকিছুই করতে পারবে।

সত্যি, প্রয়োজনের সময় গীতা হাসি মুখে সব কাজ করতে পারে। পেরেছিল। একবার নয়, কয়েকবার। ভিক্টোরিয়া কলেজের আঠার-উনিশ বছরের ছাত্রীকে সেসব দুঃসাহসিক কাজকর্ম করতে দেখে সূর্যকান্ত স্তম্ভিত হয়ে যেতেন।

তারপর একদিন শেখরদা গীতাকে বললেন, ভাই ছোড়দি, আমাদের একটা কাজ করে দিবি?

কবে তোমাদের কাজ করে দিই নি?

না, না, তা বলছি না। তবে এবারের কাজটা যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনিই অদ্ভুত।

আমার দ্বারা হবে তো?

এ কাজ তুই ছাড়া আর কেউ পারবে না।

বলো কি করতে হবে।

শেখরদার হাতে বেশী সময় নেই। তাছাড়া কখন পুলিসের লোকজন এসে পড়ে তার ঠিক-ঠিকানা নেই। তাই শেখরদা আর দেরী করেন না। বলেন, শোন ছোড়দি, নলিনীদা বলছিলেন, তুই আর সূর্য নতুন বর-বৌ সেজে কলকাতা থেকে বসিরহাট যাবি। তারপর সেখান থেকে নৌকায় দিন দুইয়ের পথ।...

গীতা সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করে, সঙ্গে কী জরুরী মালপত্র থাকবে ?

শেখরদা একটু হেসে বললেন, জরুরী তো বটেই ; তাছাড়া অনেক অনেক মালপত্র থাকবে।

গীতা একটু ভাবে।

কথাটা বলতে গিয়েও শেখরদার লজ্জা করে। তাই একটু দ্বিধার সঙ্গেই বলেন, তোদের লেপ-তোষক-বালিশের মধ্যে অনেক বুলেট থাকবে। তাই নৌকায় যাবার সময় ঠিক সদ্য বিবাহিত বর-বৌয়ের মত তোদের দুজনকে প্রায় সব সময় বিছানায় শুয়ে থাকতে হবে।

মাঝি কী আমাদের জানাশুনা হবে ?

না। বসিরহাটের ঘাটে নতুন মাঝি দেখলেই সবাই সন্দেহ করবে। সূর্যই দরদস্তুর করে নৌকা ভাড়া করবে।

পুরো দু'দিন নৌকায় থাকতে হবে ?

হ্যাঁ।

কবে রওনা হতে হবে ?

পরশু দুপুরের পর।

ফিরব কবে ?

ফেরার সময় অন্য পথ দিয়ে ফিরতে হবে। তাই এখানে ফিরে আসতে সপ্তাহখানেক লাগবে।

সে এক অবিস্মরণীয় ও রোমাঞ্চকর স্মৃতি। যাত্রা শুরু হলো পার্কসার্কাসের এক গলি থেকে। সদ্য বিবাহিত দম্পতি। দেখে মনে হয়, বড় জোর দশ-পনের দিন হলো বিয়ে হয়েছে। গীতার পরনে জরি দেওয়া নতুন শাড়ী-ব্লাউজ। গহনাগুলো চকচক করছে। দেখে বোঝা অসম্ভব গিল্টির গহনা। সূর্য জরি-পেড়ে শান্তিপুরী ধুতির উপর সার্জের পাঞ্জাবি ছাড়াও নতুন কাশ্মিরী শাল নিয়েছে।

সঙ্গে দুটো নতুন ট্রাঙ্ক, একটা নতুন স্যুটকেশ, নতুন বিছানা ছাড়া গোটা দুই পুরনো স্যুটকেশ। এ ছাড়াও টুকটাক আরো কিছু।

ফিটন গাড়ীতে চড়ে পার্ক সার্কাস থেকে শিয়ালদা। সেখান থেকে বারাসাত হয়ে বসিরহাট। শিয়ালদায় ট্রেনে চড়িয়ে দিলেন মাণিকদা। বসিরহাটের ঘাটে দূর থেকে খেয়াল রাখছিলেন আসলামদা।

ইচ্ছামতীর বুকে যখন যাত্রা শুরু হলো তখন রাত প্রায় আটটা। মাঝি বললো, খাওয়া-দাওয়া যখন হয়ে গেছে, শুয়ে পড়ুন। আমি ঝাঁপ ফেলে দিচ্ছি। নয়ত ঠাণ্ডা লাগবে।

পার্ক সার্কাস থেকে বসিরহাট আসতেই দুজনে ক্লান্ত। তাছাড়া একদিন আগে থেকে তোড়জোড় চলছে। দুজনেরই ঘুম পাচ্ছে কিন্তু দুজনে একসঙ্গে ঘুমুলে চলবে না। দুটো ট্রাঙ্কে বারোটা রিভলবার; বিছানার মধ্যে প্রচুর বুলেট। সুতরাং অতন্দ্র প্রহরীর মত একজনকে জেগে থাকতেই হবে। সতর্কও থাকতে হবে। যদি কোন অঘটন ঘটে তাহলে তার মোকাবিলা করতে হবে কিন্তু মাঝি যদি কোনক্রমে টের পায়, একজন জেগে বসে আছে, তাহলেই সন্দেহ করবে। তাইতো যে জেগে থাকবে তাকেও শুয়ে থাকতে হবে।

দুজনেই শুয়ে পড়ে। পাশাপাশি। ঠিক স্বামী-স্ত্রীর মত। তবে আগের কথা মত সূর্য জেগে থাকে। তারপর রাত আড়াইটে-তিনটের সময় গীতার পাহারা দেবার পালা শুরু হবে।

সূর্য প্রায় কাঠের মত শক্ত সোজা হয়ে শুয়ে থাকে। মুহূর্তের জন্যও যাতে গীতা অস্বস্তি বোধ না করে সে বিষয়ে সূর্যকান্ত অত্যন্ত সতর্ক কিন্তু নৌকা মাঝে মাঝেই এমন দুলে ওঠে যে সূর্য গড়িয়ে যায় গীতার কাছে, গীতা এসে পড়ে সূর্যর বুকের কাছে। সূর্য মনে মনে ক্ষমা চায় কিন্তু মুখে কিছু বলতে পারে না।

পরের দিন ভোরে মাঝি নয়াপাড়ার চণ্ডাল কালীর বটতলায়

নৌকা বেঁধে মাঠে গেলে সূর্য বললো, গীতা, আমাকে ক্ষমা করো।

কেন? কী অপরাধ করেছ?

কাল রাত্তিরে নৌকা মাঝে মাঝে এমন দুলে উঠছিল যে……

গীতা হেসে বললো, তার জন্য তো তুমি দায়ী না। তাছাড়া আমি তো জানি, তুমি কোন অন্যায় করবে না।

সাধারণ অবস্থায় নিশ্চয়ই কোন অন্যায় করব না কিন্তু এমন বিচিত্র পরীক্ষা তো……

গীতা আবার হাসে। মিট মিট করে হাসে।

সূর্যকান্ত প্রশ্ন করেন, হাসছ কেন?

শুনতে চাও?

হ্যাঁ।

গীতা হাসতে হাসতেই বলে, যদি নেহাতই পরীক্ষায় ফেল করো, তাহলে সিঁথির সিঁদুরও মুছব না, হাতের শাঁখাও খুলব না।

গীতা!

অবাক হচ্ছো কেন?

আমি যে খুব ভীতু মেয়ে না, তা তুমি নিশ্চয়ই স্বীকার করবে?

একশ'বার করব।

তাহলে ক্ষমা চেয়ো না।

সূর্যকান্ত স্তম্ভিত হয়ে যান।

সাতদিন পরে কলকাতা ফেরার পথে খুলনা স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে গীতা বলেছিল সূর্যদা, কলকাতা ফেরার আগে একটা কথা তোমাকে বলে রাখি। বিয়ে-থা করে সংসারী হবার একটুও ইচ্ছা আমার নেই। তবে যদি কোনদিন দেশ স্বাধীন হয়, যদি কোনদিন বিয়ে করি, তাহলে তোমাকেই বিয়ে করব।

সূর্যকান্ত অবাক হয়ে বলেন, তার মানে ?

তার মানে আর জানতে চেয়ো না। শুধু জেনে রাখো, এই সাতদিন তোমার সঙ্গে স্বামী-স্ত্রীর অভিনয় করার পর তোমার প্রতি আমার শ্রদ্ধা, ভক্তি, ভালবাসা হাজার গুণ বেড়ে গেছে।

কাটোয়াতে একটা দিন কাটিয়েই সূর্যকান্ত হারিয়ে গেলেন; কিভাবে যে দুটো বছর কাটালেন, তা উনিও জানেন না।

শেষ পর্যন্ত কোন উপায় না দেখে সূর্যকান্ত এক ইনসিওরেন্স কোম্পানির অফিসে কেরানীর চাকরি নিলেন। বছর খানেক পরে একজন অফিসার গৌহাটি থেকে বদলী হয়ে কলকাতা অফিসে এলেন। মাঝে মাঝেই সূর্যকান্তকে ফাইল নিয়ে তার কাছে যেতে হয়। হঠাৎ একদিন উনি জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা, আপনি কি শেখরকে চিনতেন ?

একজন শেখর ঘোষালকে চিনতাম কিন্তু···

আমার ছোট ভাই শেখর পুলিসের গুলিতে শিবপুরের গঙ্গার···

সূর্যকান্ত একটু উত্তেজিত হয়ে বললেন, আপনি শেখরদার দাদা ?

হ্যাঁ।

সূর্যকান্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

মিঃ ঘোষাল বললেন, আমি জানি আপনি ওকে খুব ভালবাসতেন, শ্রদ্ধা করতেন।

শেখরদাকে সবাই ভালবাসতেন। এমন কি সুভাষবাবু পর্যন্ত···

জানি।

অফিসার-কেরানীর সম্পর্ক হঠাৎ মোড় ঘুরল।

ছাখ সূর্য, তোমার মত ছেলেকে কেরানীগিরি করতে দেখেও মন খারাপ হয়ে যায়।

সূর্যকান্ত হেসে বললেন, মন খারাপ করবেন কেন? কেরানী হবার জন্যই ত বাঙ্গালীরা লেখাপড়া শেখে।

তা ঠিক কিন্তু তুমি ত অর্ডিনারী ছেলে না। দেশ স্বাধীন হলে তোমরাই ত মন্ত্রী-এম. এল. এ. হতে।

কি যে বলেন দাদা!

ঠিকই বলছি সূর্য।

হাজার হোক শেখরদার দাদা। সূর্যকান্ত কথাটা উড়িয়ে দিতে পারলেন না। সন্ধ্যের সময় রিপন কলেজে ল' পড়া শুরু করলেন।

রাস্তাটা একে-বেঁকে এদিক-ওদিক ঘুরে হাজির হলো ভাগলপুর কোর্টে।

আজ সূর্যদাকে দেখে চেনা যায় না। ভাবা যায় না এর অতীত এত কাহিনীতে ভরা। আজ সূর্যদা যেন সার্কাসের ক্লাউন। চিত্তবিনোদনের নিছক একটা সামগ্রী। উকিলবাবুরা ক্রিমিন্যাল প্রসিডিওর কোড আর ইণ্ডিয়ান পেনাল কোড নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে করতে ক্লান্ত হলে অবসর বিনোদনের একমাত্র উপায় সূর্যদা। আমি দুদিন কা যোগী। ক'দিনই বা কোর্টে আসছি? কাউকে কিছু বলতে পারি না। সবাই আমার সিনিয়র। কিন্তু মনে মনে ভাবি ওরা কি সূর্যদার দুটো চোখ দেখেও কিছু অনুমান করতে পারেন না?

তিন

সমস্ত উকিলবাবুদের যেমন একই পোশাক, তেমনি সব মফস্বল কোর্টের চেহারার মধ্যে একটা বিচিত্র সাদৃশ্য আছে। কুঠী-বাড়ির কোন সাহেবের বাংলোয় হয়ত প্রথম কোর্ট বসত। তারপর আস্তে আস্তে ব্যাঙের ছাতার মত নানা ধরনের ছোটখাট বা মাঝারি বাড়ি গজিয়ে উঠেছে কুঠী-বাড়ির সাহেবের বাংলোর চারপাশে। এই সব কোর্ট-কাছারি বাড়ির ফাঁকে ফাঁকে প্যাকিং কাঠের তৈরি অজস্র দোকানঘর। চা, পান, বিড়ি, সিগারেট থেকে শুরু করে মণ্ডা-মিঠাই, ডাল-ভাত, মাছ-মাংস। সব কিছু। আর মাছির মত চারপাশে ভন ভন করছে কালো কোটপরা অসংখ্য উকিল-মোক্তার। বড় রাস্তার মোড়ে রিকশা, টাঙা, গরুর গাড়ি, ঘোড়ার গাড়ির ভিড়। যেখানে যেমন। আর কিছু ফলওয়ালা। আম, জাম, লিচু, পেয়ারা। হয়ত বা দুটো-একটা আপেল আঙুরের দোকান। যে সময়ের যা। উকিলবাবুদের ভাল আমদানী হলে কিছু ফল-মিষ্টি নিয়ে বাড়ি ফেরেন।

ভাগলপুর কোর্টেরও মোটামুটি এই চেহারা। তবে দেশ স্বাধীন হবার পর অন্যান্য শহরের মত এখানেও একটা নতুন কোর্ট বিল্ডিং হয়েছে। ভাঙা-চোরা পুরনো বাড়িগুলোয় এখনও কোর্ট বসে। ঐ ভাঙা-চোরা বাড়িগুলোর একপাশে বার লাইব্রেরী। মাঝখানে বিরাট হল্। দু'পাশে সারি দিয়ে অনেকগুলো ছোট ছোট ঘর।

সর্বত্রই উকিলবাবুরা বসে পান-সিগারেট খেতে খেতে গল্পগুজব করছেন। দু'-একজন সৌভাগ্যবান হয়ত বা মক্কেলদের সঙ্গে কথা বলছেন। হল্‌ঘরের দেয়ালে কিছু বড় বড় পেন্টিং কিন্তু কোন পেন্টিং দেখে মানুষ চেনার উপায় নেই। চারপাশে অনেকগুলো আলমারি। নানা জনের স্মৃতিতে দান করা আলমারি ভরতি বই শতাব্দীর উপেক্ষায় এখন বিলীন হবার পথে। এই বিহারেই যে পৃথিবীর অর্ধেক লাক্ষা পাওয়া যায়, তা ভাগলপুর বার লাইব্রেরীর চেয়ার-টেবিল দেখে মনে হয় না। সমগ্র পরিবেশ এত নোংরা দুর্গন্ধময় যে প্রথম প্রথম পরিষ্কার জামা-কাপড় পরে বসতেও ঘেন্না করত। আগে আগে আশেপাশের দোকানগুলোয় এক কাপ চা পর্যন্ত খেতাম না। মনে হতো, অন্নপ্রাশনের অন্ন বেরিয়ে আসবে।

প্রথম প্রথম ওকালতি করতে এসে আরো অনেক কিছু দেখে অবাক হতাম। ল' পাস করা উকিলবাবুরা যে এভাবে চাতকের মত মক্কেলের আশায় সারাদিন গাছতলায় বসে থাকতে পারে, তা আমি কল্পনা করতে পারতাম না। এখন পারি।

গায়ে কালো কোট, গলায় সাদা ব্যাণ্ড, সাদা শার্ট আর তার উপর কালো গাউন চড়িয়ে উকিলবাবুদের কোর্টে আসার নিয়ম। আইন। নিম্নাঙ্গের বসন সম্পর্কে কোন নির্দেশ নেই অ্যাডভোকেট অ্যাক্টে। তবে সাদা প্যান্ট, কালো বুট পরাই চলতি নিয়ম। এখানে বোধহয় সাত-আট শ' উকিল প্রাকটিশ করেন কিন্তু দু' ডজন উকিলের বেশী গাউন ব্যবহার করেন বলে মনে হয় না। এদের মধ্যে কয়েকজন কাপড়ের থলির মধ্যে গাউনকে বন্দী করে রাখেন। কপাল গুণে মামলা-মোকদ্দমা জুটলে থলির গেরো খোলেন। ব্যাণ্ড বলতে এখানে জিভেগজার মত লংক্লথের দুটো টুকরো সুতো দিয়ে গলায় ঝুলিয়ে রাখাই বোঝায়। তাও সবার নয়। কালো কোট সবার আছে কিন্তু অধিকাংশেরই কালো কোটের রং বদলে গ্রে হয়ে গেছে। ব্যাণ্ড বস্ত্র

বা স্নো হোয়াইট ড্রাই ক্লিনার্স ভাগলপুরে নেই বলেই বোধহয় উকিলবাবুরা কোট কাচাতে পারেন না। সাদা প্যান্ট কিছু চোখে পড়লেও শ্রীচরণে বুট জুতো দেখতে হলে সৌভাগ্যের দরকার। উকিলবাবুদের শ্রীচরণেষু দেখলে এখানকার কুটির শিল্পের বৈচিত্র্যময় অগ্রগতির নমুনা পাওয়া যাবে।

বিভূতিভূষণ 'পথের পাঁচালী' না লিখে ভাগলপুরের উকিলবাবুদের নিয়ে লিখলেও কম মর্মস্পর্শী হতো না। প্রায় সবার চোখে-মুখেই নিদারুণ দুঃশ্চিন্তার ছাপ। যৌবন পেরুতে না পেরুতেই কপালের রেখাগুলো কেটে বসে গেছে। মনে হয় সবারই যেন শনির দশা।

আমি এখনো কোর্টে আসছি। হয়ত আরো কিছুদিন আসব কিন্তু তারপর নৈব নৈব চ। অনেক আশা নিয়ে ওকালতি করতে এসেছিলাম। এখন ছেড়ে দে মা, কেঁদে বাঁচি। এমন সার্বজনীন দৈন্য দেখতে দেখতে আমার চোখ জ্বালা করে। স্কুল-কলেজের ছেলেরাও বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে চা-সিগারেট খায় কিন্তু এখানে সে দৃশ্য দেখা যায় না। অনেকেই সিগারেট খান কিন্তু শখ করেও এক প্যাকেট ভাল সিগারেট কেউ কেনেন না। অনেক উকিলবাবুর আভিজাত্য আছে কিন্তু ঔদার্য বোধহয় কারুরই নেই।

কৈশোরে, যৌবনে স্বাধীনচেতা ও আদর্শবান আইনবিদদের কাহিনী শুনে অনুপ্রাণিত হয়েছিলাম। তাই তো মনে মনে ঠিক করেছিলাম, কলেজ থেকে বেরুবার পর গোলামী করার জন্য দরখাস্ত নিয়ে সরকারী বা বেসরকারী দপ্তরে দপ্তরে ঘুরব না। যেভাবেই হোক, যত কষ্ট করেই হোক, আইন পড়ব। ওকালতি করব। অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়ব। মাননীয় বিচারপতিকে বলব, ইওর অনার। লক্ষপতি, কোটিপতি, সম্ভ্রান্ত মানুষের চুরিকে বলা হয় ক্লিপটোম্যানিয়া। নিছকই একটা অসুখ। সেটা অন্যায় নয়, অপরাধ নয়; আর নিঃস্ব, দরিদ্র, সহায়-সম্বলহীন মানুষ মনিবের

সামান্য কোন জিনিস এদিক থেকে ওদিক করলেই সে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৮ ধারা মতে সোপার্দ্দ হবে এবং ৩৭৯ ধারা মতে জেলে যাবে, তা হতে পারে না।

এমনি অনেক স্বপ্ন দেখতাম। তাই তো গোটা তিনেক টিউশানি করেও আইন পড়ি। ল' কলেজে পড়ার সময় বিশিষ্ট আইনজ্ঞ অধ্যাপকদের নানা ধরনের বিচিত্র মামলার কাহিনী শুনে আরো বেশী উৎসাহিত, আরো বেশী অনুপ্রাণিত হই।

তারপর?

একদিন আইন পাস করলাম। আইন ব্যবসা করার জন্য আদালতের খাতায় নাম লেখালাম। খুব সুন্দর লেটার-হেড ছাপালাম। বাবার হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারখানার পাশের ঘরে চেম্বার করলাম। পুরনো বুক-শেলফ রং করে আইনের মোটা মোটা বইগুলো সাজিয়ে রাখলাম। বাইরে নেমপ্লেট লাগালাম। লুকিয়ে-চুরিয়ে যখন-তখন নেমপ্লেট দেখি। নামের পাশে এল. এল. বি দেখে মুগ্ধ হয়ে যাই।

ভালই হোক আর মন্দই হোক, বিয়ের পর নতুন বৌকে একটু লুকিয়ে-চুরিয়ে দেখতে, একটু কাছে পেতে সবারই ভাল লাগে কিন্তু জরি পাড় ধুতি ছেড়ার আগেই সে মোহ কেটে যায়।) সেই রকম লেটার-হেড, চেম্বার আর নেমপ্লেট দেখার মোহ কাটতেও আমার খুব বেশী সময় লাগল না।

আমার মনের হতাশার খবর কাউকে জানাই না; আমার চাপা দীর্ঘ নিঃশ্বাসও কেউ ধরতে পারেন না।

সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠে হাত-মুখ ধুয়েই চায়ের কাপ হাতে নিয়ে চেম্বারে বসি। সামনে কোন মক্কেল না থাকলেও অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে কত কী ভাবি, আইনের বই নাড়াচাড়া করি, কিছু কাগজপত্র পড়ি। সৌভাগ্যক্রমে পাড়ার মুদি হরগোবিন্দ এসে মামলার তারিখ

পিছিয়ে দেবার কথা বললে বলি, দাঁড়াও ; ডায়েরীটা দেখি সেদিন কোন জরুরী কোন কেস আছে কিনা।

হাতে তেমন কোন মামলা নেই ; ডায়েরীর পাতা খালি। তবু ডায়েরীর পাতা ত্থ'চারবার ওল্টাবার পর গম্ভীর হয়ে বলি, ঠিক আছে, আঠারই দিন নিয়ে নেব। উনিশে থেকে ক'দিন আমি খুবই ব্যস্ত থাকব।

হরগোবিন্দ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলে, বাঁচালেন। আঠারই আপনি অন্য মামলায় ব্যস্ত থাকলে আমি মহা বিপদে পড়তাম।

যাইহোক অনেক আশা, অনেক স্বপ্ন নিয়ে কোর্টে যাই কিন্তু যেদিকে তাকাই, সেদিকেই হতাশা আর দীর্ঘ নিঃশ্বাস।

সব মিলিয়ে পরিবেশটা খুব আকর্ষণীয় নয়। তবু যাই। মামলা-মোকদ্দমা না থাকলেও যাই। না গিয়ে পারি না। সমাজ-সংসারের যে চেহারা এখানে দেখা যায়, তা আর কোথাও দেখা যাবে না। আমি বিস্মিত হয়ে শুধু দেখে যাই। শুনে যাই। কখনও কোর্টে, কখনও একতলার আড্ডাখানায়।

নতুন কোর্ট বিল্ডিং-এর একতলার একখানা ঘর উকিলবাবুদের। ঘরখানি বড় নয়। মাঝারি। ত্থ'খানা টেবিলের চারপাশে পনের-কুড়িটা চেয়ার। কিছু কিছু উকিলবাবু বার লাইব্রেরীতে যান না। যাবার দরকার হয় না। অবসর পেলে এখানেই বসেন। বিশ্রাম করেন। অথবা গল্পগুজব। কারুর কোন চেয়ার নির্দিষ্ট নেই। নির্দিষ্ট আছে শুধু সূর্যদার চেয়ার। একেবারে কোণায়, টেবিলের এক প্রান্তে। হঠাৎ কোন বাইরের লোক এলে মনে করবেন, সভায় সূর্যদা সভাপতিত্ব করছেন।

লণ্ডনের সিনেমার মত এ সভার শুরুও নেই, শেষও নেই। যতক্ষণ কোর্ট চলে, ততক্ষণ সভাও চলে। ত্থ'জন মামলা লড়ে ফিরে এলে তিনজন লড়তে যান। শ্রোতারা প্রতি মুহূর্তে আসা-যাওয়া করছেন

কিন্তু সভাপতি পার্লামেন্টের স্পীকারের মত নিজের আসনে বসে সভার কাজ পরিচালনা করছেন।

কোর্টের বৃহত্তর পরিবেশে উকিলবাবুদের বিশেষ আকর্ষণীয় মনে না হলেও এ ঘরে তাদের রূপই আলাদা। এখানে অখ্যাত-বিখ্যাত নেই, ছোট-বড় নেই, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব নেই। সূর্যকান্তর রাজসভায় সবাই সমান। এখানে সবাই হাসেন, প্রাণ খুলে হাসেন। তর্ক করেন কিন্তু ঝগড়া হয় না। এই ঘরে উকিলবাবুদের দেখে আমি বিস্মিত, মুগ্ধ হই। ভালবাসি। মনে মনে শ্রদ্ধাও করি। এখানে সবাই মানুষ। সবাই ঈশ্বরের সন্তান।

কি তারা, এত হাসিখুশী কেন ? তারাবাবুকে হাসতে হাসতে ঘরে ঢুকতে দেখেই সূর্যদা প্রশ্ন করলেন।

সূর্যদা প্রশ্ন করার সঙ্গে সঙ্গে ঘরের সবাই তারাবাবুর দিকে তাকালেন। কেউ বললেন, সত্যি তারাবাবু, আজ যেন রড্ড বেশী খুশী মনে হচ্ছে। কেউ জিজ্ঞাসা করলেন, তারাবাবু, কত হাজারের ইন্সিওরেন্স পলিসি ম্যাচিওর করল ? আরো অনেকে অনেক কিছু বললেন।

রবিবাবু মহাশয় ব্যক্তি। প্রবীণ। অভিজ্ঞতায় প্রবীণতর। সাহিত্যের মাধ্যমে মনুষ্যচরিত্র জেনে প্রবীণতম হয়েছেন। খুব ভাল-ভাবে তারাবাবুকে দেখে উনি বললেন, সূর্যদা, তারাবাবুর এ হাসি সাধারণ হাসি নয়। এ হাসি প্রাণের হাসি।…

অব কোর্স !

সূর্যদার সমর্থন পাবার সঙ্গে সঙ্গেই রবিবাবু ফাইন্যাল জাজ্‌মেন্ট দিলেন, কোন মহিলাঘটিত কারণ না থাকলে এমন হাসি হাসা যায় না।

ফটিকবাবু মুখ টিপে টিপে হাসতে হাসতে বললেন, হাজার হোক বরিশালের বল্তি। দু'শ-পাঁচশ' মেয়ে না দেখে ত বৌমাকে ঘরে

আনেনি। সেই সব মেয়েদের কারুর সঙ্গে বোধহয় দেখা হয়েছে। তাই…

সুনীল সেন ক্রিমিন্যাল ল'ইয়ার। আসামীর পক্ষ সমর্থন করাই ওর কাজ। বললেন, সূর্যদা, অ্যাকিউজড্‌কে কিছু বলতে দেওয়া হবে না।

সূর্যদা সুনীল সেনের বক্তব্য আপ্-হেল্ড করে বললেন, নাউ অ্যাকিউজড্ তারা উইল মেক্ এ স্টেটমেণ্ট।

তারাবাবু হাসতে হাসতে বললেন, এই বয়সে আমার স্ত্রীর পদস্খলন হয়েছে বলে মনে এত আনন্দ।

তারাবাবুর কথায় উকিলবাবুরা মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেলেও সভাপতি সূর্যকান্ত চৌধুরী চুপ করে থাকেন না। জিজ্ঞাসা করলেন, কবে কোথায় ঘটল ?

আজ্ঞে, আজ ভোরবেলায় বাথরুমে।

এবার সবাই হাসেন।

সূর্যদা আবার প্রশ্ন করেন, গুরুতর কিছু ?

এ বয়সে পদস্খলন হওয়া মানেই ত গুরুতর ব্যাপার।

তা বটে।

এখন পায়ে প্ল্যাস্টার করে শুধু আমার শয্যাসঙ্গিনী হয়ে পড়ে থাকতে হবে।

হঠাৎ সুভাষবাবু হাঁপাতে হাঁপাতে এসেই মাথায় হাত দিয়ে বসতেই সূর্যদা জিজ্ঞাসা করলেন, কি হল সুভাষ ? মাথায় হাত দিয়ে বসলে কেন ?

অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে সুভাষবাবু বললেন, আর বলবেন না ! হতচ্ছাড়া এক সাক্ষীকে হাজারবার শিখিয়ে দেবার পরও কোর্টের সামনে বেফাঁস বয়স বলে কেসটাকেই বারোটা বাজিয়ে দিল।

দার্শনিকের মত সূর্যদা বললেন, অমন হয় কিন্তু তার জন্য মাথায়

হাত দিয়ে বসবে কেন?

আপনার সাক্ষী এভাবে পথে বসালে আপনি বুঝতেন।

আমার সাক্ষী কি করেছিল, শুনতে চাও?

সবাই একসঙ্গে বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, সূর্যদা, বলুন বলুন।

সূর্যদার গল্প শুনতে সবারই আগ্রহ। সবাই গল্পগুজব বন্ধ করে ওর দিকে তাকিয়ে রইলেন।

আগে জামালপুরের রেলের কারখানার জন্য অনেক সাহেব মুঙ্গের-জামালপুরে থাকতেন। আর সাহেবরা থাকা মানেই অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানরাও থাকবে। জামালপুরে হাজার হাজার অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান থাকত। কিছু কিছু অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মুঙ্গের-ভাগলপুরে কিছু সম্পত্তিও করেন।

জামালপুর রেলের কারখানার অ্যাসিসট্যাণ্ট ফোরম্যান প্যাট্রিক সাহেব সাহেবগঞ্জের স্টেশন মাস্টারের মেয়েকে বিয়ে করেন। প্যাট্রিক সাহেবের শ্বশুরমশাই ভাগলপুর থেকে রিটায়ার করে এখানেই থেকে যান এবং উর্দু বাজার আর নাথ নগরে চারটে বাড়ি কিনে ভাড়া দেন। এই বুড়োর ঐ এক মেয়ে ছাড়া আর কোন ছেলেমেয়ে ছিল না। তার ফলে বুড়ো-বুড়ী মারা যাবার পর মিসেস প্যাট্রিকই এই সব সম্পত্তির মালিক হলেন।

এই চারটে বাড়ির একটা বাড়ি মিসেস প্যাট্রিক বিক্রী করেন।

এদের দুই ছেলেমেয়ে ছিল। কালে কালে এই সম্পত্তি নিয়ে দুই ভাই বোনে লড়াই লাগল।

মিস প্যাট্রিক ভাগলপুর বড় হাসপাতালে সার্জিক্যাল নার্স ছিলেন ও অবিবাহিতা ছিলেন। আর ওর দাদা জামালপুর রেলের কারখানায় কাজ করতেন।

সূর্যদা এইটুকু বলে রবিবাবু আর ফটিকবাবুর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, মিস প্যাট্রিকের কথা আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে ?

রবিবাবু হেসে বললেন, সেই বিয়ে পাগলা বুড়ীর কথা বলছেন কী ?

দ্যাটস্ রাইট।

ফটিকবাবু বললেন, যে বুড়ী খুব সেজেগুজে সাইকেলে ঘুরে বেড়াত ?

আপনারা ঠিক ধরেছেন।

সুভাষবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, সূর্যদা, আমরা কি তাকে দেখিনি ?

সূর্যদা গম্ভীর হয়ে বললেন, রাস্তাঘাটে চলতে-ফিরতে যদি ঠাকুমাদের দিকে দেখার অভ্যেস থাকে, তাহলে দেখেছ। আর যদি আঁটসাঁট বাঁধুনীওয়ালা মেয়ে দেখাই তোমার নিয়ম হয়, তাহলে ভুল করেও তাকে দেখনি।

সূর্যদার কথায় সবাই একবার সুভাষবাবুর দিকে তাকিয়ে হাসলেন।

একটা সিগারেট ধরিয়ে বেশ জোরে টান দিয়ে সূর্যদা বললেন, একটা বাড়ির ভাড়া আদায় নিয়ে দু' ভাইবোনে মামলা হয়। আমি মিস প্যাট্রিকের উকিল ছিলাম কিন্তু জান সুভাষ, কেন মামলা খারিজ হয়ে যায় ?

কেন ?

মিস প্যাট্রিকের বয়স বেশী হলেও সব সময় সবাইকে বলতেন থের্টি ? অনেকবার সতর্ক করে দেওয়া সত্ত্বেও অভ্যেস মত কোর্টে সাক্ষী দেবার সময় থের্টি বলার সঙ্গে সঙ্গেই মামলা খারিজ হয়ে গেল।

সুভাষবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, তখন ওর বয়স কত ছিল ?

যখন মামলা হয় তখন ওর বয়স পঞ্চাশের উপর ছিল।

সূর্যদা হেসে বললেন, সারা শহরের মানুষ জানতো, মিস প্যাট্রিক

প্রায় পঁচিশ বছর হাসপাতালে চাকরি করছেন কিন্তু বেশী বয়স হয়েছে জানলে কেউ বিয়ে করবে না বলে……

কে যেন প্রশ্ন করেন, তাই বলে এত কমিয়ে বলতেন ?

হ্যাঁ। সব সময় সবাইকে 'থেটি' বলতে বলতে এমন অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল যে কোর্টে গিয়েও যেই বললেন 'থেটি' সঙ্গে সঙ্গে কেসের বারোটা বেজে গেল।

সূর্যদা সিগারেটে পর পর দুটো টান দিয়ে বললেন, এই বয়সের জন্য মামলা জেতার কথা বলি।

বলুন।

এক ভদ্রলোক অনেক জমিজমা রেখে মারা গেলেন। ভদ্রলোকের কোন ছেলেমেয়ে ছিল না। দুই ভাইপো সব সম্পত্তি পায়। তারপর হঠাৎ একজন পঞ্চাশ-বাহান্ন বছরের এক মহিলা দাবি করলেন যে তিনি ঐ মৃত ভদ্রলোকের মেয়ে এবং সম্পত্তি ওরই প্রাপ্য।

আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, কী আশ্চর্য !

ঐ ভদ্রমহিলার বক্তব্য ছিল যে ওর মার সন্তান হয়েই মারা যেত বলে ওর জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই দাইকে দিয়ে দেওয়া হয় এবং উনি সেই দাইয়ের কাছে মানুষ হয়েছেন। সেই বুড়ী দাই এখনও জীবিত। ভেরি ইন্টারেস্টিং কেস।

জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কোন্ পক্ষের উকিল ছিলেন ?

ভাইপোদের। মামলা শুরু হলো। অন্যান্য সাক্ষীর পর দাই বুড়ীর সাক্ষী শুরু হলো। বুড়ী সাক্ষী দেবার সময় খুঁটিনাটি সমস্ত খবর এত ভাল ভাবে বলল যে মামলা জেতার আশাই ছেড়ে দিলাম, কিন্তু বুড়ীর ঘোমটা দেখে হঠাৎ আমার সন্দেহ হলো। সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, ইওর অনার! আপনি সাক্ষীকে ঘোমটা সরাতে বলুন।

পাগলের মত প্রতিবাদ করলেন বিরোধী পক্ষের উকিল, ইওর অনার, বুড়ী অত্যন্ত সাধারণ গ্রাম্য মহিলা। কোন পরপুরুষের সঙ্গে

এরা কথা পর্যন্ত বলে না। একটা অত্যন্ত জঘন্য চক্রান্ত থেকে মেয়েটাকে বাঁচাবার জন্য বুড়ীকে অনেক বুঝিয়ে হুজুরের সামনে হাজির করা হয়েছে। পুরুষমানুষে ভরা কোর্টের মধ্যে সাক্ষী কিছুতেই ঘোমটা সরাতে পারে না।

ইওর অনার, সাক্ষীকে আমাদের সবার সামনে ঘোমটা খুলতে হবে না কিন্তু সাক্ষীকে অন্ততঃ একবার আপনার চেম্বারে ঘোমটা খুলে মুখের চেহারা দেখাতেই হবে।

ইওর অনার, আমার সাক্ষী আপনার হুকুম অমান্য করবেন না কিন্তু সাক্ষীর মুখের চেহারা দেখার কি কোন প্রয়োজন আছে?

ইওর অনার, বহু পুরুষ মেয়েলী গলায় চমৎকার কথা বলতে পারেন। বহু অল্পবয়সী মেয়েদের গলা বুড়ীদের মত হয়।

কোর্টের লোকজন হেসে উঠলেও জজ্ বললেন, সূর্যবাবুর দাবি খুবই যুক্তিযুক্ত। আমি চেম্বারে ওকে দেখতে চাই না। সাক্ষীকে এখানেই ঘোমটা সরাতে হবে।

সূর্যদা এক গাল হাসি হেসে বললেন, সাক্ষী ঘোমটা সরাতেই কোর্টে যেন বোমা ফাটল।

কেন? কেন?

সাক্ষীর বয়স বড় জোর তিরিশ!

অনেকেই এক সঙ্গে বলে উঠলেন, কি আশ্চর্য!

সূর্যদা হাসতে হাসতে বললেন, বুঝলে সুভাষ, কলিকালে তিরিশ বছরের ছুঁড়ি পঞ্চাশ বছরের বুড়ীর দাই মা হয়!

যখন আড্ডা ভেঙে যায়, ঘর খালি হয়, আর কোন উকিলবাবু থাকেন না, তখনও আমি সূর্যদার পাশে বসে থাকি। পুরনো দিনের কথা ও কাহিনী শুনি।

সূর্যদা একটু শুকনো হাসি হেসে বললেন, আজ রেপ কেসের গল্প শুনে সবাই হাসে কিন্তু প্রথম যখন রেপ কেস করি তখন তার পিছনে অনেক কারণ ছিল।

তাই নাকি ?

শুধু টাকা রোজগারের জন্য ওকালতি করা শুরু করি নি।...

তবে ?

আজও দেশে কত অন্যায়-অবিচার চলছে। সুতরাং ভাবতে পার পঁয়ত্রিশ-চল্লিশ বছর আগে কত অন্যায়-অবিচার চলত আমাদের সমাজে ?

তা ঠিক।

কিছু কিছু অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে লড়ব বলেই ওকালতি করা শুরু করি। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সূর্যদা বললেন, বিহারের ভূমিহারদের অত্যাচারের কথা তোমরা কিছু কিছু জান। কিছু কিছু শুনেছ। আগে এই অত্যাচার যে কি নিদারুণ ছিল তা আজ বললে অবিশ্বাস্য মনে হবে।

তাই নাকি ?

গরীব চাষী-টাসীদের বাড়িতে আগুন দেওয়া, খুন করা বা তাদের বাড়ির মেয়েদের রেপ করা নিত্যকার ঘটনা ছিল, কিন্তু ভয়ে কেউ কিছু করত না। আমাদের বাড়ির এক বুড়ো চাকরের পুত্রবধূকে এক ভূমিহারের পুত্র দিনের পর দিন রেপ করার পরই আমি নিজে খরচ করে মামলা লড়তে শুরু করলাম।

সূর্যদার মুখখানা বেদনায় ভরে গেল। আর কথা বলতে পারলেন না।

কিছুক্ষণ পর আমি প্রশ্ন করি, আপনাদের বুড়ো চাকরের পুত্রবধূ কী এমন অপরাধ করেছিল যে ভূমিহারের পুত্র তাকে······

সূর্যদা গম্ভীর হয়ে বললেন, অপরাধ করেছিল তার স্বামী। ধান-

কাটার সময় সে ক'দিন কামাই করে; তাছাড়া সে ঋণ নিয়ে শোধ করে নি। উনি একটু হেসে বললেন, এসব অপরাধ কী ভূমিহাররা বরদাস্ত করতে পারে? তাই তার পুত্র গরীব চাষী ছেলেটাকে শাস্তি দেবার জন্য ওর কুড়ি-একুশ বছরের বৌটাকে নিত্য অত্যাচার করতে করতে প্রায় মেরে ফেলেছিল।

এসব শুনে আমার মুখ বিকৃত হয়ে ওঠে।

সূর্যদা আমার মুখের দিকে না তাকিয়েই আপন মনে বললেন, তখন আমার বয়স অল্প। তারপর পরের উপকার করার বদ নেশাটা তখন অত্যন্ত প্রবল ছিল। তাই মরণ পণ করে ঝাঁপিয়ে পড়লাম ঐ হারামজাদা ভূমিহার নন্দনকে ঠাণ্ডা করতে।

কনভিকশন হয়েছিল?

কনভিকশন তো অনেক পরের কথা। সবার আগে অনেক তেল-খড় পুড়িয়ে ছোঁড়াটাকে এ্যারেষ্ট করার ব্যবস্থা করলাম। তারপর বছর দুই ধরে মামলা চলার পর ছোড়াটাকে বছর খানেকের জন্য জেলে পাঠাতে পারি।

মেয়েটার কী হলো?

বহুদিন হাসপাতালে থাকার পর সুস্থ হলো কিন্তু ঐ জানোয়ারটার অকথ্য অত্যাচারের জন্য বেচারার ইউট্রাসটা এমনই ড্যামেজ হয়েছিল যে অপারেশন করে ওটা ফেলে দিতে হয়।

তখন আমার বয়সটা নেহাতই অল্প না হলেও মেয়েদের জীবনে ইউট্রাসের গুরুত্ব বোঝার মত সময় হয় নি। তাই চুপ করে থাকলেও সূর্যদার কথায় বুঝলাম, মেয়েটার খুবই ক্ষতি হলো।

সব কোর্টেই এমন দু'একজন উকিল থাকেন যিনি সবারই দাদা, সবারই আপন, সবারই বন্ধু। ভাগলপুর কোর্টের উকিল সূর্যকান্ত চৌধুরী এমনই একজন। আমি এই কোর্টে সামান্য কিছুদিন আসছি। তাই সূর্যদার অনেক কিছুই আমি জানি না। সূর্যদাকে বেশ বয়স্ক

মনে হলেও সঠিক বয়স অনুমান করতেও আমার দ্বিধা হয়। জগদীশবাবুর মত প্রবীণ বৃদ্ধও ওকে দাদা বলে ডাকেন; আবার শিব চাড়ুজ্যের কথাবার্তা শুনলে মনে হবে, ওরা এক সঙ্গে পড়াশুনা করতেন। ওদিকে জগদীশবাবুকে শিব চাড়ুজ্যে চাচাজী বলে ডাকেন।

শুধু বয়সের ব্যাপারেই নয়, আরো অনেক ব্যাপারেই সূর্যদার সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা করা মুশকিল। তারাবাবু ঠিকই বলেন, সূর্যদা হচ্ছেন ভাদ্দর মাস। আকাশে এমনই মেঘ যে সকাল না বিকেল, বিকেল কি রাত্তির, তা বোঝার উপায় নেই। সত্যি সূর্যদার অনেক ব্যাপারেই অনেক কিছু অনুমান করা যায়।

সূর্যদা প্রতিদিন কোর্টে আসেন কিন্তু দেখে মনে হয় না, ওকালতি করার প্রতি ওর কোন আগ্রহ বা উৎসাহ আছে। ওর কী অর্থের প্রয়োজন নেই? কিন্তু উনি যে খুব সচ্ছল তাও মনে হয় না। ওর কী অভাবও নেই, প্রাচুর্যও নেই?

আমি অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইলাম। তারপর জিজ্ঞাসা করলাম, আচ্ছা সূর্যদা, আজকাল আপনি বিশেষ প্র্যাকটিশ করেন না কেন?

সূর্যদা একটু ম্লান হাসি হেসে বললেন, সে এক দীর্ঘ ইতিহাস। একটা মামলায় জিতেও নিজের মনের কাছে হেরে গেলাম। তাই···

কোন্ মামলা?

সূর্যদা হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে শোলার হ্যাটটা মাথায় চড়িয়ে বললেন, আজ না। পরে বলব।

চার

সুখের হোক, দুঃখের হোক, অতীত স্মৃতি রোমন্থন করা মানুষের স্বভাব। ধর্ম। কেউ নীরবে, কেউ সরবে, কেউ সবাইকে জানিয়ে, কেউ আপন মনে সেই ফেলে আসা দিনগুলোর মুখোমুখি হন। সূর্যকান্ত চৌধুরী বিগত দিনগুলোর ধূসর স্মৃতিতে আপন মনেই আনমনা হয়ে ঘুরে বেড়ান। সে বিচিত্র স্মৃতির অরণ্যে অন্যের প্রবেশ নিষেধ। তবু আমার মত দু'একজন অল্পবয়সী উকিল কখনও অনুমতি নিয়ে, কখনও বিনা অনুমতিতেই সে স্মৃতির অরণ্যে প্রবেশ করি। না করে পারি না।

সেদিন কথা দিলেও সূর্যদা অনেক দিন আমাকে এড়িয়ে গেছেন। কিছু বলতে চান নি। খুব বেশী চেপে ধরলে বলেছেন, ভাগলপুর কোর্টের পাঁচ-সাত শ' উকিলের মধ্যে সূর্যকান্ত চৌধুরী একটা বুদবুদ মাত্র। তবু আমি নিরাশ হইনি। অন্য উকিলদের ভিড় কম থাকলেই আমি ওর কানে কানে বলেছি, সূর্যদা, অনেক দিন হয়ে গেল। এখনও আপনি সে মামলার কথা বললেন না।

সূর্যদা হেসে বলেন, ছোটবেলায় ঠাকুমার কোলে চড়ে গল্প শোনার অভ্যেসটা এখনও তোমার গেল না!

এই ভাবে আরো কিছুদিন কেটে গেল। তারপর একদিন সূর্যদা নিজেই এগিয়ে এলেন।

কিষণলাল এই চৌধুরী বাড়িরই একজন হয়ে গিয়েছিল। না হবার কারণ নেই। অনাদিকান্ত চৌধুরী যখন ওকে এ বাড়িতে প্রথম নিয়ে আসেন তখন কিষণলাল সাত-আট বছরের শিশু। তখন এমন দিনও গেছে যখন কিষণলাল রাত্রে বাবা-মার জন্য কাঁদলে অনাদিবাবুর স্ত্রীর কাছে শুয়ে থেকেছে। কিছুদিন পর কিষণলাল অনাদিবাবুর একমাত্র সন্তান কৃষ্ণকান্তের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে উঠল। হাজার হোক সমবয়সী ত! তারপর কিষণলালের বিয়ে হলো। তার কয়েক বছর পর কৃষ্ণকান্তের বিয়ে হলো। সূর্যকান্তের জন্ম হবার কিছু দিন পরেই কিষণলালের স্ত্রী মারা গেল।

আজকের সূর্যকান্ত চৌধুরীকে দেখলেই বুঝা যায় ওর বাবাও নিশ্চয় খুব সংসারী ছিলেন না। একে বাড়ির একমাত্র ছেলে, তার উপর স্কুল মাস্টার। নিছক ভাব-ভোলা ভাল মানুষ ছিলেন। সংসার চালাত কিষণলাল।

মিউনিসিপ্যালিটির চিঠিটা পেয়েই কৃষ্ণকান্ত জিজ্ঞাসা করলেন, হ্যাঁরে কিষণ, বাড়ীর ট্যাক্স দেওয়া হয় নি?

মিনসিপ্যালিটির ট্যাক্স?

হ্যাঁ।

কে বললো দেওয়া হয় নি?

এই যে চিঠি এসেছে।

এক সপ্তাহ আগে ট্যাক্স দিয়ে এসেছি। তবু চিঠি দিয়েছে? কিষণলাল সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণকান্তের হাত থেকে চিঠিটা নিয়ে বললো, কালকে ঘোষবাবুকে ধরব।

তাই বলে তুই রাগারাগি করিস না।

কিষণলাল ভুরু কুঁচকে বললো, একবার ভুল হতে পারে কিন্তু তাই বলে পর পর দু'বার ত ভুল হতে পারে না।

ঘোষবাবুকে রসিদটা দেখিয়ে বলিস…

এবার কিষণলাল হেসে বললো, আমি জানি ঘোষবাবু তোমার বন্ধু। ভয় নেই, কিছু ঝগড়া-টগড়া করব না।

ভিতর থেকে ডাক পড়তেই কিষণলাল চলে যায়। অনাদিবাবুর বিধবা স্ত্রীর ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল, মা, ডাকছিলেন?

হ্যাঁরে কিষণ, বৌমা বলছিলেন, সরষের তেল দিয়ে যায় নি।

কাল সকালে দিয়ে যাবে।

ঠিক দেবে ত?

না দিয়ে গেলে আমিই নিয়ে আসব।

সূর্যদা হেসে বললেন, খুব ছোটবেলায় আমি কিষণদার কাঁধে চড়ে স্কুলে যেতাম। কোনদিন ক্লাসে পড়াশুনা না পারলেই মাস্টারমশাইরা ওর কাছে নালিশ করতেন—

কিষণলাল তোমার এই ছোট বাবুটি আজ অঙ্ক পারে নি।

ক'টা অঙ্ক পারে নি?

দুটো অঙ্ক ভুল করেছে।

ক'টা ঠিক করেছে।

আটটা।

কিষণলাল হেসে জবাব দেয়, বাড়ির ছেলেদের মাথায় হিসেব-নিকেশ একেবারেই ঢোকে না। ছোটবাবু আটটা পেরেছে কিন্তু ওর বাবা ত চারটেও পারত না।

মাস্টারমশাইকে ও কথা বললেও বাড়ি ফেরার পথে সূর্যকান্তকে বলতেন, ছোটবাবু, কাল দশটা অঙ্ক না পারলে আমি আর ঐ মাস্টারের কাছে মুখ দেখাতে পারব না।

পরের দিন দশটা অঙ্ক ঠিক হওয়ায় কিষণলালের সেকি আনন্দ! বাড়িতে ফিরেই সোজা বুড়ীর কাছে বলে, জানেন মা, কাল নিত্যহরি

মাস্টার কি যা তা বলল

কেন ?

ছোটবাবু আটটা অঙ্ক পেরেছে, মাত্র দুটো পারে নি। আজ ছোটবাবু দশটার মধ্যে দশটা অঙ্কই ঠিক করে নিত্যহরিকে ঠাণ্ডা করে দিয়েছে।

নাতির কৃতিত্বে ঠাকুমা খুশীর হাসি হেসে বললেন, হারামজাদার মাথায় ত বুদ্ধি আছে কিন্তু এত দুরন্তপনা করে বলেই ত······

এইটুকু ছেলে দুরন্তপনা করবে না ত কি আমি আপনি করব ?

সঙ্গে সঙ্গে সূর্যকান্তর মা বলেন, কিষণ, তুমি আর ওকে মাথায় চড়িও না।

কিষণলাল কালবিলম্ব না করে সুপ্রীম কোর্টে আবেদন করে, আচ্ছা মা, আমি ছোটবাবুকে মাথায় চড়াচ্ছি ?

শাশুড়ী কিছু বলার আগেই সূর্যকান্তর মা বললেন, রোজ রোজ স্কুল থেকে আনার সময় কে ওকে জিলেপী খাওয়ায় ? আমি ?

ভারী ত একদিন না দুদিন খাইয়েছি !

এই ভাবেই দিন কাটে। কদাচিৎ কখনও কিষণলাল দেশে যায় কিন্তু এ বাড়ি ছেড়ে বেশী দিন থাকতে পারে না। চলে আসে।

সূর্যকান্তর ঠাকুমা জিজ্ঞাসা করেন, কিরে কিষণ, তুই যে এরই মধ্যে ফিরে এলি ?

আর কত দিন দেশে বসে থাকব ?

এত বার করে বলছি তবু একটা বিয়ে করছিস না। বুড়ো বয়সে কে দেখবে তোকে ?

আপনি কিছু চিন্তা করবেন না মা। ছোটবাবুর ছেলেমেয়েরা ত আমাকে ফেলে দিতে পারবে না।

নারে কিষণ, তুই একটা বিয়ে কর।

কোন একটা কাজের অছিলায় কিষণ চলে যায়। বুড়ীর কথার জবাব দেয় না।

বেশ কয়েক বছর কেটে গেল। সূর্যকান্ত ম্যাট্রিক পাস করে কলকাতার কলেজে ভরতি হলেন। গরমের ছুটিতে এসে শুনলেন, কিষণলাল বিয়ে করতে দেশে গেছে।

সূর্যদা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, বহু কাল পরে ভাগলপুরে ওকালতি প্র্যাকটিশ করতে এসে দেখি কিষণলালের দ্বিতীয় বউ মারা গেছে। ওর বড় মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে আর ছোট্ট চার-পাঁচ বছরের মেয়েটাকে নিয়ে ও আমাদের বাড়িতেই আছে।

ইতিমধ্যে চৌধুরী বাড়ির চেহারাও পালটে গেছে। ঠাকুমা নেই। বাবা-মা চলে গেছেন। অন্যান্য ভাইবোনেরাও বাইরে। কোর্ট থেকে আসার পর, কোন মক্কেল না থাকলে কিষণলালের ঐ ছোট্ট মেয়েটাকে নিয়েই সূর্যকান্তর দিন কাটে।

মাইয়া শোন।

কি বাবুজী?

তোর জন্য বইখাতা আনব। এবার থেকে রোজ পড়াশুনা করবি।

নতুন কিতাব এনে দেবে বাবুজি?

নতুন ছাড়া কি পুরোনো আনব?

তবে জরুর পড়ব।

পরের দিনই বইখাতা-শ্লেট-পেন্সিল আসে। সীতা মহানন্দে পড়াশুনা শুরু করে। দিন দশেকের মধ্যেই অ-আ-ক-খ আর এ-বি-সি-ডি মুখস্থ হয়ে যায়। সূর্যকান্ত উত্তেজিত হয়ে ডাক দেন, এই কিষণ, চট করে শুনে যা।

বুড়ো কিষণলাল হাঁপাতে হাঁপাতে উপরে এসেই জিজ্ঞাসা করে, কি হলো ছোটবাবু? এমন করে ডাকলে কেন?

মাইয়া, চট করে একবার অ-আ-ক-খ আর এ-বি-সি-ডি মুখস্থ বলে দে ত।

সীতা সঙ্গে সঙ্গে গড়গড় করে অ-আ-ক-খ আর এ-বি-সি-ডি বলে যায়।

সূর্যকান্ত আনন্দের আতিশয্যে সীতাকে জড়িয়ে ধরে কোলে তুলে নিয়েই বলেন, শুনলি কিষণ, শুনলি? তুই দেখিস কিষণ, আমি মাইয়াকে বি. এ. পাস করাবই।

কিষণলাল একটু হেসে বলে, তুমি কি যে বল ছোটবাবু! আমাদের ঘরের ছেলেমেয়ের কি লেখাপড়া হয়?

সূর্যকান্ত একটু রেগেই বলেন, তুই কি ভেবেছিস, মাইয়া শুধু তোরই মেয়ে? ও কি আমার কেউ না?

কিষণলাল আর কিছু বলে না। আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে নামতে ভাবে, চিরকুমার ছোটবাবু মেয়েটাকে নিয়ে বেশ আছে কিন্তু এর যখন বিয়ে হয়ে যাবে তখন কী হবে?

বছর ঘুরতে না ঘুরতেই সীতার পড়াশুনা অনেক এগিয়ে যায়।

বাবুজি, তুমি আমার পড়া ধরবে না?

না।

কেন?

সূর্যকান্ত গম্ভীর হয়ে বললেন, আজ কোর্ট থেকে আসার পর তুই যখন আমাকে আদর করিস নি, তখন আমিও তোর পড়া ধরতে পারব না।

তুমি আমাকে কোলে নাও নি কেন?

তখন যে আমার সঙ্গে আরো তিন-চারজন এলো। তা না হলে···

এখন ত কোন লোকজন নেই। এখন কোলে নাও।

সূর্যকান্ত না হেসে পারেন না। হাসতে হাসতেই সীতাকে

কোলে তুলে নিয়ে বলেন, মাইয়া, পরের জন্মে আমাকে তোর পেটে জন্মাতেই হবে।

বাবুজি, পড়া ধরবে না ?

না।

তাহলে এখন আমি কি করব ?

আগে দুটো বিস্কুট খেয়ে আয়, তারপর বলছি।

এখন বিস্কুট চাইলে পিতাজী বকবে।

বলবি, আমি বলেছি।

সীতা সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে চলে যায়। একটু পরেই আবার দৌড়ে ফিরে আসে। বলে, খেয়েছি। এবার কি করব ?

একবার 'বাবুরাম সাপুড়ে'টা শুনিয়ে দে।

সীতা একবার ঢোঁক গিলে নিয়ে চোখ দুটো বড় বড় করে শুরু করে—

বাবুরাম সাপুড়ে, কোথা যাস্ বাপু রে ?
আয় বাবা দেখে যা, দুটো সাপ রেখে যা—

এবার সীতা একটু হাসতে হাসতে বলে—

যে সাপের চোখ্ নেই, শিং নেই, নোখ নেই,
ছোটে না কি হাঁটে না, কাউকে যে কাটে না,
করে নাকো ফোঁসফাঁস, মারে নাকো ঢুঁশঢাঁশ,
নেই কোন উৎপাত, খায় শুধু দুধ ভাত…

সূর্যকান্ত আর চুপ করে শুনতে পারেন না। জিজ্ঞাসা করেন, মাইয়া, তুই দুধ-ভাত খাস না কেন ?

গাল দুটো ফুলিয়ে সীতা বলে, দুধ খেলেই আমার পেট ব্যথা করে।

তোর দুটো কানই আমি কেটে দেব মাইয়া।

তোমাকে ছুঁয়ে বলছি, দুধ খেলেই পেটের মধ্যে কেমন কেমন করে।

বিস্কুট-লজেন্স-চানাচুর খেলে পেটে কিছু হয় না, তাই না মাইয়া ?

সীতা হেসে বলে, সেই বুধবারের পর চানাচুর খেলাম কোথায় ?

আজ কি বার মাইয়া ?

আজ ত শুক্রবার।

বুধবার অনেক দিন আগে চলে গেছে, তাই না ?

আগে ত রোজ খেতাম।

তুই দুধ না খেলে আমি আর চানাচুর কিনে আনব না।

সত্যি এনে দেবে না ?

হঠাৎ কিষণলাল এসে জিজ্ঞাসা করল, ছোটবাবু, তুমি কোর্ট থেকে এসে কিছু খাও নি কেন ?

কে বললো খাই নি ?

আমি এখুনি দেখে এলাম, যেমন খাবার দিয়েছিলাম, তেমনি পড়ে আছে।

তাহলে কাজ করতে করতে ভুলে গেছি।

শুনেই সীতা খুশীর হাসি হেসে বললো, বাবুজি, এবার আমি তোমাকে বকুনি দিই ?

কিষণলাল রেগে ওঠে, আঃ! বেটি!

সীতা তর্ক করে, আমি খেতে ভুলে গেলে বাবুজি কেন বকুনি দেয়।

বাবুজি বকুনি দেয় বলে তুইও বকুনি দিবি ?

এবার সূর্যকান্ত বললেন, কিষণ, ছোটদের শুধু উপদেশ দিলে হয় না। বড়দের সে কাজ করে দেখাতে হয়। তা না হলে ওরা আমাদের কথা শুনবে কেন ?

তাই বলে বেটি তোমাকে বকুনি দেবে ?

সূর্যকান্ত সীতাকে কোলে টেনে নিয়ে বললেন, এ হতভাগী যে আমার মাইয়া।

সূর্যদা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, তুমি ভাবতে পারবে না মাইয়া আমার কি ছিল। সী ওয়াজ এ পিস্ অফ ড্রীম! সত্যি এক টুকরো স্বপ্ন ছিল।......

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, মাইয়া কি নেই?

না নেই।

কি হয়েছিল?

সূর্যদা একটু করুণ হাসি হেসে বললেন, সব বলব। ব্যস্ত হচ্ছো কেন? উনি হঠাৎ পাশ ফিরে রবিবাবু আর ফটিকবাবুকে জিজ্ঞাসা করলেন, মাইয়ার কথা নিশ্চয়ই আপনাদের মনে আছে?

আমি ভাবছিলাম, এতক্ষণ আমিই শুধু সূর্যদার গল্প শুনছিলাম। জানতে পারি নি, বুঝতে পারি নি, আস্তে আস্তে ঘর ভরে গেছে। আরো অনেকেই ওর জীবন-কাহিনীর সব চাইতে স্মরণীয় অধ্যায় শুনছেন।

রবিবাবুও একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, সূর্যবাবু, ওকে যে একবার দেখেছে, সে কি কোনদিন ভুলতে পারবে?

ফটিকবাবুও সঙ্গে সঙ্গে বললেন, সত্যি, মেয়েটা যে আমাদের কি দারুণ ভালবাসত তা ভাবলেও অবাক লাগে। মাইয়া মারা যাবার পর আমার মা লিচু খাওয়াই ছেড়ে দিলেন।

আমি জানতে চাই, কেন?

ফটিকবাবু একটু ম্লান হাসি হেসে বললেন, আমাদের বাড়ির পিছনে লিচু গাছে লিচু হলেই ও রোজ আমার মার কাছে লিচু খেতে আসত। মরার ক'দিন আগে মাকে বলেছিল, ঠাম্মা, এবার তোমাকে একটাও লিচু দেব না; সব আমি খেয়ে ফেলব।

দিনগুলো বেশ কাটছিল। এত বড় বাড়িতে সূর্যকান্ত একলা

থাকলেও মাইয়ার জন্য সব সময় প্রাণচঞ্চল থাকত। ইদানীংকালে 'আবোল তাবোল'-এর কবিতা ওর মাথায় ঢুকেছে। এখন যখন-তখন কথায় কথায় 'আবোল তাবোল'-এর কবিতা বলবে। সূর্যকান্ত কোর্ট থেকে ফিরে বারান্দায় পা দিতে না দিতেই মাইয়া জিজ্ঞাসা করল—

শুনতে পেলাম পোস্তা গিয়ে—
তোমার নাকি মেয়ের বিয়ে ?

সূর্যকান্ত হেসে বললেন, এ খবর আগে পাস নি ?

মাইয়া আবার বলে—

গঙ্গারামকে পাত্র পেলে ?
জানতে চাও সে কেমন ছেলে ?

সূর্যকান্ত খুব আগ্রহের সঙ্গে মাথা নাড়তেই ও বলে যায়—

মন্দ নয়, সে পাত্র ভালো—
রঙ যদিও বেজায় কালো ;
তার উপরে মুখের গঠন
অনেকটা ঠিক পেঁচার মতন।

সূর্যকান্ত মাইয়াকে কোলে তুলে নিয়েই বলেন, না, না, এ ছেলের সঙ্গে আমি কিছুতেই আমার মাইয়ার বিয়ে দিতে পারি না।

কোনদিন মাইয়া জানতে চায়, আচ্ছা বাবুজি, তুমি শিবঠাকুরের দেশের আইন-কানুন জানো ?

না ত।

আমি জানি।

বিস্মিত হয়ে সূর্যকান্ত জিজ্ঞাসা করেন, ওখানকার আইন-কানুন কেমন ?

চোখ দুটো বড় বড় করে মাথা নেড়ে মাইয়া বললো—

কেউ যদি যায় পিছলে প'ড়ে
প্যায়দা এসে পাকড়ে ধরে।

সে কি?

হ্যাঁ বাবুজি।

বিচার হয়?

কাজির কাছে হয় বিচার
একুশ টাকা দণ্ড তার।

আরো আইন আছে?

সেথায় সন্ধে ছ'টার আগে
হাঁচতে হ'লে টিকিট লাগে।

কি আশ্চর্য?

এই শুনেই তুমি আশ্চর্য? ওখানে—

কারুর যদি দাঁতটি নড়ে
চারটি টাকা মাশুল ধরে,
কারুর যদি গোঁফ গজায়
একশো আনা ট্যাক্স চায়—

সূর্যকান্ত মজা করে দৌড়ে পালাতে পালাতে বলেন, আমি একশো আনা ট্যাক্স দিতে পারব না।

সূর্যকান্ত জীবনে অনেক দুঃখ পেয়েছেন। ঘরে ও বাইরে। একে একে সব স্বপ্ন ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে। জীবনে যাঁদের সান্নিধ্যে এসে ধন্য হয়েছেন, যাঁদের ভালবাসায় মুগ্ধ হয়েছেন, তাঁরা কোথায় যেন হারিয়ে গেল। জীবনের সব চাইতে স্মরণীয় অধ্যায়ে যাদের কাছে পেয়েছিলেন, তাদেরও কাছে পান না সূর্যকান্ত। কেউ পুলিশের গুলিতে বা ফাঁসীর দড়িতে প্রাণ দিয়েছেন, কেউ বা বিকলাঙ্গ হয়ে কোনমতে দিন কাটাচ্ছেন। আর যে দুঃসাহসিনীকে নিয়ে ইছামতীর কোলে ভাসতে ভাসতে জীবন-নদীর মোহনায় পৌঁছবার স্বপ্ন দেখেছিলেন, সে কাটোয়ার গ্রামে বৈধব্য জীবন যাপন করছে।

সূর্যকান্ত মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, আর কোন মানুষের খুব

ঘনিষ্ঠ হবেন না ; ভালবাসবেন না আর কাউকে। কিন্তু মাইয়া সব গণ্ডগোল করে দিল। সূর্যকান্ত আবার স্বপ্ন দেখতে শুরু করলেন।

কোর্ট বন্ধ হলেই সূর্যকান্ত ভাগলপুর থেকে পালিয়ে যান। কিষণলালকে বলেন, আমরা পরশুই যাব। সব ঠিকঠাক করে রাখিস।

কিষণলাল সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করে, তুমি কী এবারও মেয়েটাকে সঙ্গে নেবে ?

তবে কী ও এখানে পড়ে থাকবে ?

তুমি কাজে যাচ্ছ ; ওকে সঙ্গে নিলে অযথা তোমার ঝামেলা হবে।

সূর্যকান্ত সাফ বলে দেন, সে তোকে ভাবতে হবে না।

সত্যি সূর্যকান্ত কোনবারই কিষণলালকে বিশেষ কিছু ভাবনা-চিন্তা করার সুযোগ দেন না। আগে থেকেই দুটো টিকিট কাটেন। বন্ধু-বান্ধবকে চিঠি দেন, কোর্ট খোলা থাকলে দিনগুলো তবু কোন-মতে কাটে কিন্তু কোর্ট বন্ধ হলে আর এক মুহূর্তও এখানে থাকতে পারি না। পটুয়াটোলার স্মৃতি আর তোমাদের মত দু' চারজন ঘনিষ্ঠ সহকর্মীরা আমাকে চুম্বকের মত টানে। তাই তো সুযোগ পেলেই কলকাতা ছুটে যাই। এবারেও আসছি। বুধবার সকালে পৌঁছব। যথারীতি সঙ্গে মাইয়া থাকবে।

হ্যাঁ, সূর্যকান্ত মাইয়াকে নিয়েই সব জায়গা ঘুরে বেড়ান। এমন কি কাটোয়ার ঐ গণ্ডগ্রামেও হাজির হন। গীতা মাইয়াকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে বলেন, কিরে বেটি, তুই আবার এসেছিস ?

মাইয়া হেসে বলে, তুমিই তো বাবুজিকে নিয়ে আসতে বলেছিলে।

গীতা গম্ভীর হয়ে বলেন, কই ! না তো !

মাইয়া অবাক হয়ে বলে, মাজী, তুমি জরুর বলেছিলে। একটু

থেমে আবার বলে, তুমি না বললেও আমি আসব।

কেন রে বেটি ?

তোমার কাছে এলে খুব মজা হয়।

কী আবার মজা হয়।

মাইয়া সোজাসুজি জবাব না দিয়ে বলে, আমি তো বাবুজিকে বলেছি, আমাকে মাজীর কাছে রেখে দাও।

গীতার মা সূর্যকান্তকে বলেন, সত্যি, মাইয়াটা বেশ হচ্ছে। মেয়েটাকে দেখলেই আদর করতে, ভালবাসতে ইচ্ছে করে।

সূর্যকান্ত বলেন, জানেন মাসীমা, মাইয়া ভাগলপুর ফিরে গেলে কিছুদিন শুধু আপনাদেরই কথা বলে।

বেচারী এখানে এসে এত আনন্দ করে যে ফিরে গেলে তো মন খারাপ হবেই।

সূর্যকান্ত বলেন, পূর্ণদার কাছে আরো দু' চারদিন কাটাবার ইচ্ছে ছিল কিন্তু মাইয়ার জন্যই তাড়াহুড়ো করে আপনাদের এখানে চলে আসতে হলো।

আমিও বছরে এক-আধবার পূর্ণর কাছে যাই। ওর কাছে গেলে সত্যি আসতে ইচ্ছে করে না!

জানেন তো মাসীমা, যে দারোগার গুলিতে পূর্ণদাকে বিকলাঙ্গ করে দেয়, সেই দারোগার একমাত্র মেয়ে-জামাই পূর্ণদারই পাশের বাড়ী থাকে ?

মাসীমা একটু ম্লান হাসি হেসে বলেন, জানি। সে বিষ্টু দারোগাকেও আমি খুব ভালভাবে চিনি।

কাটোয়ার দিনগুলো বেশ কাটে। মাইয়াকে নিয়ে মাসীমা পাড়ায় বেড়াতে বেরুলে গীতা প্রশ্ন করে, আচ্ছা সূর্যদা, মাইয়ার বিয়েতে আমাকে নেমন্তন্ন করবে তো ?

নেমন্তন্ন করব মানে? তুমিই তো সব কিছু করবে।

ঠিক বলছ ?

একশ'বার ঠিক বলছি।

কিন্তু আমি যে বিধবা!

তাতে কী হল ?

যদি কেউ আপত্তি করে ?

অন্যের আপত্তি-সম্মতি বিবেচনা করে আমি কোন কাজ করি না।

একটু চুপ করে থাকার পর গীতা বলে, নিজের অধিকারে তো তোমার ওখানে যেতে পারব না। তাই মাইয়ার বিয়ের সময় যদি যেতে পারি তাহলে বেশ হবে।

সূর্যকান্তর নিঃসঙ্গ জীবন মাইয়াকে নিয়ে বেশ কেটে যায় আনন্দে, আনন্দে-খুশিতে।

তারপর ?

হঠাৎ একদিন হাসি থেমে গেল। কিষণলাল মারা গেল। মাইয়া কাঁদল, সূর্যকান্তও কাঁদলেন। শ্বশুরবাড়ি থেকে ছুটে এলো কিষণ-লালের বড় মেয়ে রাধা। সেও কাঁদল। তারপর একদিন রাধার সঙ্গেই মাইয়া চলে গেল। দিদির সঙ্গে যাবার একটুও ইচ্ছে ছিল না মাইয়ার কিন্তু রাধু যখন নিতে চাইল, সূর্যকান্ত আপত্তি করতে পারলেন না। এখানে ওকে কে দেখবে? এইটুকু মেয়ে ত সারা দিন এত বড় বাড়িতে একলা একলা থাকতে পারে না। না চাইলেও সূর্যকান্ত বললেন, হ্যাঁ রাধু, তুই ওকে নিয়ে যা। আমাদের এই বুড়ো ঠাকুরের উপর ভরসা করে ত ওকে রাখা যায় না।

মাইয়া চলে যাবার পর সূর্যকান্ত ক'দিন কোথাও বেরুলেন না। সারা দিন বাড়ির মধ্যে বসে বসে শুধু মাইয়ার কথাই ভাবতেন। তারপর যেদিন উনি প্রথম কোর্টে গেলেন, সেদিন সবাই ওকে দেখে

অবাক। সেই উজ্জ্বল সুন্দর মুখখানা কেমন যেন মলিন। চোখে ক্লান্তি। চুলে পাক ধরেছে। সেই তখন থেকেই ওর বার্ধক্য শুরু।

রাধুর শ্বশুরবাড়ি খুব দূরে নয়। কহলগাও থেকে মাইল পনের-কুড়ি। জমি-জমা যথেষ্ট থাকলেও রাধুর শ্বশুরের অনেকগুলি ছেলে বলে বাড়িতে অশান্তি লেগেই থাকত। ভাইদের মধ্যে লাঠালাঠি প্রায় নিত্যকার ঘটনা ছিল। কিন্তু সব অশান্তির মূলে থাকত রাধু। অতি সামান্য কথাকে নিয়েই লঙ্কাকাণ্ড শুরু করে দিত। মাইয়া চুপ করে সব দেখে, শোনে আর ভাবে। সারা দিন। কখনও কখনও সারা রাত। শেষ পর্যন্ত হাঁপিয়ে উঠে বললো, দিদি, আমাকে পাঠশালায় ভরতি করে দাও না। আমি পড়ব।

ফালতু লেখাপড়া শিখে কি হবে? দুদিন পরেই ত স্বামীর ঘরে চলে যাবি।

সারা দিন বাড়িতে বসে থাকার চাইতে ত পাঠশালায় যাওয়া ভাল। আমিও ভগবতীর সঙ্গে পাঠশালায় যাব, আসব।

ভগবতী ছোট্ট বলে পাঠাই। তাছাড়া নরেশবাবু অত জোর না করলে আমিও ওকে পাঠাতাম না।

শেষপর্যন্ত অনেক কান্নাকাটি করার পর মাইয়াও নরেশবাবুর পাঠশালায় ভরতি হলো। রোজ সকালে ভগবতীর সঙ্গে যায়, দুপুরের পর ফিরে আসে। আর যাতায়াতের পথে ভগবতী মাসীর কাছে ভাগলপুরের গল্প শোনে। বাবুজির কথা শোনে। আরো কত কি। ভগবতী খুব খুশী। খুশী নরেশ মাস্টারও। এমন ছাত্রী ওর পাঠশালায় নেই। এত দিন বাড়িতে বসে না থাকলে মাইয়া কত কি শিখতে পারত। একদিন নরেশ মাস্টার ওকে জিজ্ঞাসা করলেন, মাইয়া, তুমি এত দেরি করে ভরতি হলে কেন? এত দিন বসে না থেকে যদি আমার কাছে পড়তে তাহলে আরো কত কি শিখতে পারতে।

মাইয়া মুখ নীচু করে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

কি হলো মাইয়া ? আমার কথার জবাব দিচ্ছ না যে।

দিদি আমাকে পড়াতে চায়নি।

কেন ?

মাইয়া আবার চুপ।

পড়াতে চায়নি কেন ?

নরেশ মাস্টার আরো কয়েকবার জানতে চাইবার পর মাইয়া বললো, আমি ভগবতীর চাইতে অনেক বড় আর আপনি ত বুড়ো না।

নরেশ মাস্টার হো হো করে হাসেন। হাসি থামলে বললেন, আমি বুড়ো না হলেও তোমার চাইতে অনেক অনেক বড়। তোমার বয়স এগারো আর আমি পঁচিশ। ডবলেরও বেশী।

তা হোক। নরেশ মাস্টারকে মাইয়ার সত্যি ভাল লাগে। ঠিক বাবুজির মত দরদ দিয়ে পড়ান। হাসেন। গল্প করেন। তাছাড়া ওর স্বভাবই ভারী চমৎকার। কোনদিন কোন ছাত্রছাত্রীকে বেত মারা ত দূরের কথা, একটা চড়ও মারেন না।

দিনগুলো বেশ কাটছিল কিন্তু হঠাৎ একদিন মাইয়ার পাঠশালায় যাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। দু' চারদিন পর নরেশ মাস্টার ভগবতীকে জিজ্ঞাসা করলেন, মাইয়ার কি জ্বর হয়েছে ?

নেই মাস্টারজী। মাসী ভালই আছে।

তবে পাঠশালায় আসছে না কেন ?

মাসীর বিয়ে।

বিয়ে ?

হ্যাঁ মাস্টারজী।

কবে ?

তা জানি না, তবে এই মাসেই।

মাইয়ার কোথায় বিয়ে হচ্ছে ?

এই ত শ্রীপুরে।

শ্রীপুরে ?

হ্যাঁ মাস্টারজী।

কার সঙ্গে ?

বোধহয় রঘুনাথের সঙ্গে।

নরেশ মাস্টারের মুখ দিয়ে হঠাৎ বেরিয়ে গেল, ঐ বুড়ো রঘুনাথের সঙ্গে ?

বোধহয়।

নরেশ মাস্টার আর কোন প্রশ্ন করলেন না। চুপ করে বসে বসে শুধু মাইয়ার কথাই ভাবছিলেন।

সবকিছু ঠিকঠাক করার পর রাধু সূর্যকান্তকে খবর দিয়েছিল কিন্তু তখন বিয়ের মাত্র ক'দিন বাকি। তখন আর কিছু করার নেই। বাধা দিলে কেলেঙ্কারী হবে বলে সূর্যকান্ত শুধু নিজের কর্তব্য সম্পাদন করেই চুপ করে রইলেন।

মাইয়া কাঁদতে কাঁদতে বৃদ্ধ রঘুনাথের সঙ্গে চলে গেল।

সূর্যকান্তর আবার স্বপ্নভঙ্গ হল।

বছর ছয়েক পরে সূর্যকান্তর বাড়িতে হঠাৎ একজন লোক এসে বললো, বাবুজি, মাইয়াকে পুলিস ধরে নিয়ে গেছে ?

সূর্যকান্ত চমকে উঠলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, কেন ?

মার্ডার চার্জ।

মার্ডার ?

হ্যাঁ বাবুজি। ভগবতীকে মার্ডার করার সন্দেহে পুলিস মাইয়া আর ওর স্বামী রঘুনাথকে ধরে নিয়ে গেছে।

সূর্যকান্ত আপন মনে মাথা দোলাতে দোলাতে বললেন, না, না, এ হতে পারে না।

লোকটি সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে বললো, বাবুজি, আমি যাই?

কিন্তু তুমি কে?

বাবুজি, আমি ওখানকার চৌকিদার। আগে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের নিয়ে একটা পাঠশালাও চালিয়েছি। আমার নাম নরেশ। তবে কাউকে বলবেন না আমি আপনার কাছে এসেছিলাম।

না, না বলব না।

নরেশ চলে গেল।

পুলিস কাস্টডিতে মাইয়াকে দেখেই সূর্যকান্ত চোখের জল আটকাতে পারলেন না। মাইয়া ত পাগলের মত কেঁদে উঠল। সূর্যকান্ত ওর মাথায় হাত দিয়ে বললেন, তোর এই বুড়ো ছেলে যত দিন বেঁচে আছে তত দিন তোর ভয় কি রে? কাঁদিস না। সব ঠিক হয়ে যাবে।

পাঁচ

ইওর অনার, আপনি জানেন সব খুনের পিছনেই কিছু কারণ, কিছু ইতিহাস থাকে। এ মামলাতেও আছে। মৃতা ভগবতীর মা রাধারাণী ও এক নম্বর অভিযুক্তা মাইয়া দুই বোন। তবে এরা আপন বোন নয়। কিষণলালের প্রথমা স্ত্রীর একমাত্র সন্তান এই রাধারাণী ও দ্বিতীয়া স্ত্রীর একমাত্র সন্তান এই মাইয়া। বিমাতার সন্তান হলেও কিষণলালের মৃত্যুর পর রাধা মাইয়াকে নিজের কাছে নিয়ে আসে ও অত্যন্ত স্নেহে যত্নে মানুষ করে। ওদের সমাজে দশ-বারো বছরের মেয়েকে লেখাপড়া শেখাবার রীতি-নীতি না থাকলেও রাধা স্নেহপরবশ হয়ে বোনকে পাঠশালায় পাঠায়। বিয়ে দেবার জন্য পাঠশালায় পাঠানো বন্ধ করার পরই মাইয়া দিদির উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়, কিন্তু সে ভুলে যায় সামান্য গৃহ-ভৃত্যের কন্যা হয়ে তার লেখাপড়া শেখার চাইতে বিয়ে করে স্বামীর ঘর করাই কল্যাণকর ও স্বাভাবিক।

সরকার পক্ষের উকিলের বক্তব্য শুনতে শুনতে সূর্যকান্ত আর চুপ করে থাকতে পারলেন না। উঠে দাঁড়িয়েই বললেন, ইওর অনার, আই প্রটেস্ট।

সরকার পক্ষের উকিল নিজের আসনে বসতেই জজ্ সূর্যকান্তর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, মিঃ চৌধুরী, আপনি কি বলতে চান?

ইওর অনার, কিষণলাল গৃহ-ভৃত্য ছিল ঠিকই কিন্তু সে সাধারণ গৃহ-ভৃত্য ছিল না।

জজ্‌ সাহেব একটু বিদ্রূপের হাসি হেসে বললেন, বাড়ির চাকর আবার এক্সট্রা-অর্ডিনারী হয় নাকি ?

জজ্‌ সাহেবের প্রশ্ন শুনে সরকার পক্ষের উকিল হো হো করে হেসে উঠলেন।

সূর্যকান্ত গর্জে উঠলেন, অফ কোর্স ইওর অনার। এই কোর্টেই শত শত উকিল আছেন। সবাই আইন কলেজ থেকে পাস করেছেন কিন্তু সব উকিল কি সমান কৃতিত্বসম্পন্ন ? সব উকিলের আইনজ্ঞান কি সমান ?

জজ্‌ কিছু বলার আগেই সূর্যকান্ত বললেন, নো ইওর অনার ! নেভার ! এই কোর্টেই কত বিচারক বিচার করেছেন ও করছেন কিন্তু সব বিচারকের বিচার কি সমান হয় ? নো ইওর অনার ! নেভার ! এই শহরে কত ডাক্তার আছেন কিন্তু সব ডাক্তার কি সমান চিকিৎসা করেন বা করতে পারেন ? নো ইওর অনার। নেভার।

সূর্যকান্তর সে মূর্তি, সে গর্জনে সারা কোর্টঘর স্তব্ধ। বিস্মিত। কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে হতবাক্‌ হয়ে তাকিয়ে আছে মাইয়া আর তার স্বামী।

ইওর অনার, কিষণলাল অত্যন্ত অল্প বয়সে আমাদের বাড়িতে কাজ করতে এলেও আস্তে আস্তে বুদ্ধির জন্য, সততার জন্য, কর্তব্য-জ্ঞানের জন্য সারা সংসারের সব দায়িত্ব তার উপর পড়ে। এই শহরে আমাদের দুটো ভাড়াটে-বাড়ির চারজন ভাড়াটেকে জিজ্ঞাসা করলেই জানতে পারবেন, কিষণলাল শুধু ভাড়া আদায় করত না, বাড়ির মেরামত বা তাদের নানা রকম সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা করত। এখানকার মিউনিসিপ্যালিটির অফিসে বা সুজাগঞ্জ বাজারের বিভিন্ন দোকানে খবর নিলেও কিষণলালের বুদ্ধি, বিবেচনা ও সততার কথা জানা যাবে।......

সরকার পক্ষের উকিল উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, ইওর অনার,

কিষণলালের বুদ্ধি বা সততার কাহিনী শুনে এই মামলায় কোন সাহায্য করবে বলে ত মনে হচ্ছে না।

জজ্ বললেন, ইয়েস মিঃ চৌধুরী, কিষণলালের সঙ্গে এই মামলার কি সম্পর্ক?

ইওর অনার, মাইয়া আকাশ থেকে পড়েনি। সে শৈশবে, কৈশোরে কিভাবে কোন্ পরিবেশে কাদের সাহচর্যে মানুষ হয়েছে, তা জানা দরকার।

হোয়াই?

কারণ যে শিশু শৈশব থেকে ঘৃণ্য, নোংরা, অন্যায়-অবিচার-ব্যভিচারের মধ্যে বড় হয়, পরবর্তী জীবনে তার মধ্যে এই সব প্রবৃত্তি কোন না কোন ভাবে প্রকাশ হতে পারে। কিন্তু ইওর অনার, মাইয়ার মত যে শিশু কিষণলালের মত আদর্শ বাবাকে দেখেছে ও ভদ্র-সভ্য পরিবেশে বড় হয়ে উঠেছে, তার মধ্যে কোন ঘৃণ্য প্রবৃত্তির বিকাশ হওয়া খুবই অস্বাভাবিক ও অপ্রত্যাশিত।

সরকার পক্ষের উকিল আবার বলেন, ইওর অনার, মাইয়ার সুখ-শান্তি বিবেচনা করে রাধা তার বিয়ের ব্যবস্থা করে। যার সঙ্গে মাইয়ার বিয়ে হয়, সে শ্রীপুর গ্রামের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ও যথেষ্ট সম্পত্তির মালিক। তবে পাত্রের বয়স একটু বেশী ছিল বলে······

সঙ্গে সঙ্গে সূর্যকান্ত জজ্‌কে মনে করিয়ে দিলেন, ইওর অনার, তেরো বছরের মাইয়ার সঙ্গে বাহান্ন বছরের রঘুনাথের বিয়ে হয়! এবং মাইয়া হচ্ছে ওর চতুর্থা স্ত্রী!

ইওর অনার, রঘুনাথের বয়স একটু বেশী হলেও বিয়ের সময় তার স্বাস্থ্য খুবই ভাল ছিল ও আগের তিন বউ জীবিত ছিল না। শুধু তাই নয়, প্রথম তিন স্ত্রীর কোন সন্তানও ছিল না।

সরকার পক্ষের উকিলের প্রত্যেকটি কথার জবাব দিলেন সূর্যকান্ত। ইওর অনার, নিছক বোনের বিয়ে দেবার জন্যই রাধা রঘুনাথের সঙ্গে

মাইয়ার বিয়ে দেয় না। রাধার শ্বশুরের এগারটি ছেলেমেয়ে। সংসারে অশান্তি লেগেই থাকত। তাছাড়া রাধা অত্যন্ত লোভী ও হীন মনোবৃত্তিসম্পন্ন মেয়ে।

মিঃ চৌধুরী, রাধাও ত কিষণলালেরই মেয়ে।

হ্যাটস্ রাইট, ইওর অনার। কিন্তু মাইয়ার মত সে বাবার কাছে মানুষ হয়নি। সে কুটিল গ্রাম্য পরিবেশে বড় হয়েছে। তাই বিষয়-সম্পত্তি টাকাকড়ির উপর ওর বড় লোভ। মাইয়ার বিয়ে দিয়ে সে লুকিয়ে রঘুনাথের কাছ থেকে টাকা নিয়ে সোনার গহনা তৈরি করেছে, একথা একাধিক সাক্ষী হুজুরের সামনে বলেছেন।

ইওর অনার, রঘুনাথের বয়স বেশী হলেও সে স্ত্রীর প্রতি কর্তব্য পালনে কোন ত্রুটি করেনি। সে প্রতি বছর ফসল বিক্রী করার পরই মাইয়াকে গহনা গড়িয়ে দিয়েছে, সে……

ইওর অনার, স্ত্রীকে শুধু শাড়ি গহনা দেওয়াই স্বামীর একমাত্র কর্তব্য নয়। স্ত্রীকে দৈহিক ও মানসিক সুখ দেওয়া স্বামীর অবশ্য-কর্তব্য। কিন্তু রঘুনাথ মাইয়াকে সে সুখ দিতে পারেনি ও পারে না।

ইওর অনার, রাধা নিছক কর্তব্য প্রণোদিত হয়েই বোনের বিয়ে দেয় এবং রঘুনাথের শারীরিক ক্ষমতার কথা তার পক্ষে জানা সম্ভব ছিল না। কিন্তু মাইয়া মনে মনে ধারণা করল যে দিদি কোন চক্রান্ত করেই ওর বিয়ে দিয়েছে এবং একথাও ভাবল দিদি রঘুনাথের সম্পত্তি বেহাত করার জন্যই……

ইওর অনার, রঘুনাথের প্রথমা স্ত্রী কলেরায় মারা গেলেও দ্বিতীয়া স্ত্রী আত্মহত্যা করে, একথা অন্যান্য সাক্ষী ছাড়াও রঘুনাথ নিজেও স্বীকার করেছে। তৃতীয়া স্ত্রীর মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা না গেলেও যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে এবং বোধহয় সেই হতভাগ্য মেয়েটিও অতৃপ্তির জন্যই আত্মহত্যা করে। ইওর অনার, আপনি অনুগ্রহ করে একথাও ভুলে যাবেন না, রঘুনাথ শারীরিক অক্ষমতার

জন্য স্ত্রীকে খুশী বা সুখী করতে না পারলেও বিকৃত রুচিসম্পন্ন ও অত্যন্ত ঘৃণ্য জীবন যাপন করে।

কিন্তু ইওর অনার, হিন্দু বিবাহ নিছক অদৃষ্টের ব্যাপার। রঘুনাথের যে দোষ-গুণই থাকুক না কেন, তার জন্য রাধাকে দায়ী বা দোষী করা মাইয়ার উচিত নয় এবং ইওর অনার, এর জন্য দুই বোনের সম্পর্ক খারাপ হওয়া কোন উপযুক্ত কারণ নয়।

সেই বছরখানেক আগের কথা। ছাত্রছাত্রীর অভাবে নরেশ মাস্টারের পাঠশালা বন্ধ হবার পর অন্যান্য দিনের মত সেদিনও সকালের দিকে ভগবতী বুঝি মাসীর বাড়ি যাচ্ছিল। গ্রামের নানাজনে নাকি তাকে শ্রীপুরের দিকে যেতে দেখেছে কিন্তু দুপুর গড়িয়ে যাবার পরও যখন সে বাড়ি ফিরল না, তখন চারদিকে লোক ছুটল। ভগবতীর এক কাকা পাঁচ-সাতজন লোক নিয়ে মাইয়ার বাড়িতে হাজির হয়ে বললো, দরজা খোল।

কেন?

ভগবতী আছে কিনা দেখব।

না ভগবতী এখানে আসেনি।

সবাই বলছে ভগবতী এদিকে এসেছে আর না বললেই হলো?

আমি বলছি ভগবতী আসেনি, আসেনি, আসেনি।

এসেছে কি আসেনি, তা আমরাই দেখব। তুই আগে দরজা খোল।

আমি একলা বাড়িতে আছি। আমি দরজা খুলব না।

অনেক তর্ক-বিতর্কের পরও মাইয়া দরজা খুলল না। ওর ঐ এক কথা, ভগবতী আসেনি আর স্বামী ক্ষেত থেকে না ফিরলে দরজা খুলব না। ঘণ্টা দুয়েক পর চল্লিশ-পঞ্চাশ জন লোক হামলা করার পর

মাইয়াকে দরজা খুলতেই হলো। না, মাইয়ার বাড়িতে ভগবতীকে পাওয়া গেল না কিন্তু পিছন দিকের আমবাগানে তার মৃতদেহ মাটি আর গোবর দিয়ে ঢাকা অবস্থায় পাওয়া গেল।

হৈ-চৈ শুনে নরেশ চৌকিদার এলো। গ্রামের দুজন লোককে থানায় পাঠিয়ে দিয়ে সে মৃতদেহ পাহারা দিতে লাগল। সন্ধের পর সাব-ইন্সপেক্টর চার জন কনষ্টেবল আর নরেশ চৌকিদারকে নিয়ে টর্চ আর পেট্রোম্যাক্সের আলোয় সারা বাড়ি তন্ন তন্ন করে দেখলেন। না, কোথাও কোন রক্তের দাগ বা রক্তমাখা কাপড়-চোপড় বা অস্ত্র পেলেন না। শহর থেকে ডি-এস-পি এলেন। তিনিও দেখলেন। ভগবতীর দেহ সম্পূর্ণ উলঙ্গ করে পরীক্ষা করা হলো। মাথার পিছন দিকে আঘাতের চিহ্ন দেখা গেল। ময়না তদন্তের জন্য দেহ পাঠিয়ে দেবার পর দুই গ্রামের বহুজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলো। তারপর মাইয়া আর রঘুনাথকে পুলিস থানায় ধরে নিয়ে গেল।

প্রায় ছ'মাস ধরে তদন্ত করার পর পুলিস চার্জশীট দিল। রাধা ও মাইয়ার সম্পর্ক অত্যন্ত খারাপ ছিল এবং দুই বোনের ঝগড়াঝাটি লেগেই ছিল। ঘটনার দিন ভগবতীকে অনেকেই মাইয়ার বাড়ির দিকে যেতে দেখেছে এবং এই পথ দিয়ে অন্য কোথাও যাবার প্রশ্নই ওঠে না। মাইয়া যদি নির্দোষ হতো তাহলে সে স্বেচ্ছায় তার ঘরবাড়ি দেখাতো কিন্তু আত্মীয়স্বজনকে পর্যন্ত তার ঘরবাড়ি দেখতে না দেবার একটি মাত্রই কারণ হতে পারে এবং তা হচ্ছে সে নিজেই ভগবতীকে হত্যা করে লুকিয়ে রেখেছে। চার্জশীটে আরো অনেক কিছুই বলা হলো।

জেলা জজের কোর্টে বিচার শুরু হলো। দু'পক্ষ থেকে হাজির হলো ডজন ডজন সাক্ষী। পাবলিক প্রসিকিউটর সদলবলে হুজুরকে কত কি বললেন। কত কি দেখালেন। জামা, কাপড়, গহনা, আরো কত কি। তারপর প্রবীণ পাবলিক প্রসিকিউটর স্বয়ং আর্গুমেন্ট

শুরু করলেন, ইওর অনার, রাধা মাইয়াকে সন্তানতুল্য স্নেহ করতো, ভালবাসত কিন্তু মাইয়া তার দিদির সর্বনাশ করার জন্যই ভগবতীকে ভালবাসার অভিনয় করতো। সাক্ষ্যপ্রমাণাদির দ্বারা যখন সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে ভগবতী শ্রীপুরে মাইয়ার বাড়ির দিকেই যাচ্ছিল এবং তার মৃতদেহ ওদের বাড়ির পিছনেই পাওয়া যায় তখন এতে সন্দেহের অবকাশ কোথায় ? তাছাড়া গ্রামের লোকজনকে বাড়ি দেখতে না দেওয়ায় তার অপরাধী মনের পরিচয় পাওয়া যায়।

পাবলিক প্রসিকিউটর একবার চারদিক তাকিয়ে দেখে মাইয়ার দিকে হাত দেখিয়ে বললেন, ইওর অনার, এই জঘন্য চক্রান্ত ও হত্যার জন্য মাইয়ার ফাঁসি হওয়াই একমাত্র শাস্তি। আর রঘুনাথ নিশ্চয়ই এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ ভাবে জড়িত ও সে অবশ্যই এর আভাস আগেই পেয়েছিল। সে জন্য তারও ফাঁসি হওয়াই উপযুক্ত শাস্তি হবে।

এবার সূর্যকান্ত উঠলেন। ইওর অনার, দুই বোনের সম্পর্ক খারাপ ছিল, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার করতেই হবে মাইয়া ভগবতীকে ভালবাসত। রাধা ও মাইয়ার মধ্যে বয়সের ও স্বভাবের এতই পার্থক্য যে তাদের মধ্যে স্বাভাবিক প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারেনি। একাধিক গ্রামবাসী ও সর্বোপরি নরেশ মাস্টার ওরফে নরেশ চৌকিদারের সাক্ষ্য সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করে মাইয়া ভগবতীকে গভীরভাবে ভালবাসত।

ইওর অনার, একথা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে গ্রামের পাঠশালা উঠে যাবার পর ভগবতী রোজ সকালে মাসীর বাড়ি যেতো এবং ঘটনার দিনও বোধহয় সে মাসীর বাড়ি যাচ্ছিল। যদি মাইয়া ওকে গভীর ভাবে ভাল না বাসত তাহলে ভগবতী প্রতিদিন মাসীর কাছে যেতো কেন ? আর বোনকে শিক্ষা দেবার জন্য কি এমন স্নেহের পাত্রী, প্রিয় পাত্রীকে হত্যা করা সম্ভব ? না, ইওর অনার।

ইওর অনার, মান্যবর পাবলিক প্রসিকিউটর হাজার বার ওদের সমাজের গোঁড়ামির কথা বলেছেন, কিন্তু আপনিই বলুন, অশিক্ষিত কুসংস্কারাচ্ছন্ন রঘুনাথের স্ত্রী হয়ে সে কিভাবে স্বামীর অনুপস্থিতিতে একদল অপরিচিত পুরুষকে বাড়ির মধ্যে ঢুকতে দিতে পারে? যদি কোন পরিচিতা মহিলাকে মাইয়া বাড়িতে ঢুকতে না দিত তাহলে নিশ্চয়ই সন্দেহের অবকাশ থাকত।

ইওর অনার, শহরের মত গ্রামের বাড়ি পাঁচিল দিয়ে ঘেরা হয় না। রঘুনাথের বাড়িও ঘেরা নয়। এমন কি তার বাড়ির সীমানা পর্যন্ত নির্দেশ করা নেই। যে আমবাগানে ভগবতীর মৃতদেহ পাওয়া গেছে সেখানে যে-কোন দিক থেকেই যাওয়া যায়। বলরামের জমি পার হয়ে এসে যে মৃতদেহ ওখানে রেখে যায়নি, তার কি প্রমাণ আছে?

ইওর অনার, ময়না তদন্তে জানা গেছে লোহার রড বা অনুরূপ কিছু দিয়ে মাথার পিছন দিকে আঘাতের ফলেই ভগবতীর মৃত্যু হয়েছে, কিন্তু এই রকম লোহার রড মাইয়ার বাড়ির মধ্যে বা আশে-পাশে কোথাও পাওয়া যায়নি। কোন রক্তমাখা জামাকাপড় বা অনুরূপ কোন চিহ্নও কেউ ওখানে দেখেছে বলে জানা যায়নি। তাছাড়া মাইয়ার মত মেয়ের পক্ষে কি জানা সম্ভব দেহের কোন্ অঙ্গে একটি আঘাত করেই মানুষ মারা যায়? মাইয়ার পক্ষে কি···

মিঃ চৌধুরী, তাহলে ভগবতীকে কে হত্যা করল?

ইওর অনার, একথার জবাব দেবার দায়িত্ব আমার নয়, পুলিসের। পুলিস যদি সনাতন পদ্ধতিতে তদন্ত না করে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে তদন্ত করতো, তাহলেই এই প্রশ্নের জবাব পাওয়া যেতো। কিন্তু ইওর অনার ইট ইজ টু লেট নাউ। কিশোরী ভগবতীর মৃত্যু অত্যন্ত দুঃখের কিন্তু আরো বেশী দুঃখের কথা এই যে আসল হত্যাকারীকে আর জানার উপায় নেই।

সূর্যদা থামলেন। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। তারপর একবার উদাস দৃষ্টিতে বাইরের আকাশের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, হেরে গেলাম ?

আমি প্রায় চিৎকার করে উঠলাম, হেরে গেলেন ?

হ্যাঁ।

ফাঁসির অর্ডার দিলেন ?

না, মাইয়াকে দশ বছর রিগোরাস ইম্প্রিজনমেণ্ট আর রঘুনাথকে ছেড়ে দিলেন।

তারপর ?

সূর্যদা একটু শুকনো হাসি হেসে বললেন, মাইয়া সঙ্গে সঙ্গে বাবুজি বলে একটা চিৎকার করেই পড়ে গেল। আমি মাইয়াকে বললাম, মাইয়া, আমি যদি বেঁচে থাকি তাহলে কেউ তোকে জেলের মধ্যে রাখতে পারিবে না। এবার সূর্যদা আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, হাইকোর্টে আপীল ফাইল করলাম আর মনে মনে ঠিক করলাম, হাইকোর্টে হেরে গেলে সুপ্রীম কোর্টে যাব।

মাইয়ার পক্ষে আপনিই হাইকোর্টে অ্যাপিয়ার হলেন ?

সূর্যদা কিছু বলার আগেই ফটিকবাবু বললেন, পাটনা হাইকোর্টের বিখ্যাত জজ্ জাস্টিস শেলভান্‌কর সূর্যদা সম্পর্কে কি বলেছিলেন জান ?

কি ?

বলেছিলেন, মিঃ সূর্যকান্ত চৌধুরীস্ টোটাল ডেডিকেসন টু রুল অফ ল' অ্যাণ্ড অনেস্টি অফ পারপাজ এই মহামান্য হাইকোর্টের বহু মাননীয় ব্যারিস্টারদের মধ্যেও দেখা যায় না।

কিন্তু হাইকোর্ট কি রায় দিলেন ?

মাইয়া ছাড়া পেল ?

রবিবাবু আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, জাস্টিস শেলভান্‌কর

সূর্যদার প্রায় প্রত্যেকটা আর্গুমেণ্ট অ্যাকসেপ্ট করে বলেছিলেন, হাজার রকম সন্দেহের কারণ থাকলেও নিছক সন্দেহের বশে কাউকে শাস্তি দেওয়া যায় না। সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত খুনের মামলায় কাউকে একদিনের জন্যও জেল দেওয়া অন্যায়।

আমি চুপ।

সূর্যদা গম্ভীর হয়ে বললেন, জাস্টিস শেলভান্‌কর একথাও বলেছিলেন, মাইয়া স্বামীর বিনা অনুমতিতে এক দল পুরুষকে বাড়িতে ঢুকতে না দিয়ে কোন অন্যায় করেনি; বরং সাধারণ হিন্দু ঘরের বউয়ের কর্তব্য পালন করেছে। তাছাড়া অন্য কোন লোক যে ভগবতীকে খুন করে ওদের বাড়ির পিছনের জমিতে রেখে যায়নি, তাই বা কে বলতে পারে?

সুনীল সেন বললেন, আমরা যারা ক্রিমিন্যাল কেস করি, তারা এখনও এ জাজ্‌মেণ্ট দেখিয়ে বলি যে শুধু পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করে কাউকে শাস্তি দেওয়া যায় না।

আমি সূর্যদার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, তারপর?

সূর্যদা খুব জোরে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, তারপরও শুনতে চাও?

রঘুনাথ আগেই জানিয়ে দিয়েছিল, তার বাড়িতে আর মাইয়ার স্থান হবে না। সূর্যকান্ত জেল গেটে পৌঁছে দেখলেন, শুধু নরেশ চৌকিদার দাঁড়িয়ে আছে। আর কেউ মাইয়াকে নিতে আসেনি। মাইয়া বেরিয়ে এসেই সূর্যকান্তকে জড়িয়ে ধরে পাগলের মত কেঁদে উঠল। বললো, বাবুজি, আমরা কোথায় যাব বলতে পারো?

সূর্যকান্ত প্রথমে বুঝতে পারেননি। তারপর নরেশ ওর দুটো পা জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠতেই সব পরিষ্কার হয়ে গেল। সূর্যকান্ত একটা

দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন, আমি ত বেঁচে আছি। চিন্তা করছিস কেন? আমার বাড়ি কি তোর বাড়ি না?

মাইয়া আর নরেশ দুজনকেই নিয়ে এলেন কিন্তু সূর্যকান্তর মনে নতুন করে অনেক প্রশ্ন এলো। ক্লান্তিতে, অবসাদে প্রথম ক'দিন কোর্টে গেলেন না। তারপর কিছুক্ষণের জন্য গিয়েই ফিরে আসেন। নিজের চেম্বারে বসে থাকেন। কি যেন ভাবেন। আকাশ-পাতাল। কত কি। বুড়ো ঠাকুর খাবার-দাবার দেয়। মাইয়া দেখাশুনা করে কিন্তু বিশেষ কথাবার্তা বলে না। কথা বললেও দুটো-একটা।

বাবুজি, শোবে না?

একটু পরে।

মাইয়া আলতো করে সূর্যকান্তর হাত ধরে বলে, না বাবুজি শোবে চল। অনেক রাত হয়েছে।

সূর্যকান্ত কোন কথা না বলে আস্তে আস্তে উঠে সোজা শোবার ঘরে যান। শুয়ে পড়েন। মাইয়া মশারী গুঁজে দেবার পর সূর্যকান্তর মাথায়-মুখে হাত দিতে দিতে বলে, বাবুজি, তুমি আর আমাকে মাইয়া বলে ডেকো না।

এ কথা বলছিস কেন মাইয়া?

যে মেয়ে তোমাকে এত কষ্ট দিচ্ছে তাকে আর মাইয়া বলে…

মাইয়া আর কথা বলতে পারে না। ওর এক ফোঁটা চোখের জল সূর্যকান্তর কপালে পড়তেই উনি মাইয়াকে কাছে টেনে নিয়ে বলেন, তোকে মাইয়া বলে ডাকলে বুকের ভিতরটা জুড়িয়ে যায়।

আমি সব জানি বাবুজি কিন্তু…

সূর্যকান্ত ওর মুখে হাত দিয়ে বলেন, না, না, মাইয়া, তুই কিছু অন্যায় করিসনি।

এই ভাবেই আরো ক'টা দিন কেটে গেল।

সেদিন সন্ধেবেলায় সূর্যকান্ত বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসেছিলেন।

হঠাৎ মাইয়া আর নরেশ এসে ওকে প্রণাম করল।

কিরে মাইয়া, হঠাৎ প্রণাম করলি কেন ?

বাবুজি, আজ রামনবমী। কয়েক মিনিট চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকার পর মাইয়া কাঁদতে কাঁদতে বললো, বাবুজি, তুমি আমাদের ক্ষমা করো।

সূর্যকান্ত তাড়াতাড়ি ওকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে বললেন, ওরে হতভাগী, তুই আমার মা, তুই আমার মেয়ে। শত অন্যায় করলেও তোকে ক্ষমা না করে আমি থাকতে পারি ?

মুহূর্তের মধ্যে মাইয়া একটু অদ্ভুত ভাবে হেসে উঠে বললো, জান বাবুজি, আমার এখনও 'আবোল-তাবোল'-এর কবিতা মনে আছে।

তাই নাকি ?

হ্যাঁ বাবুজি। তুমি শুনবে ?

বল।

শুনতে পেলাম
পোস্তা গিয়ে —
তোমার নাকি
মেয়ের বিয়ে ?
গঙ্গারামকে পাত্র
পেলে ?
জানতে চাও সে
কেমন ছেলে ?

সূর্যকান্ত অবাক হয়ে বললেন, এখনও তোর সব মুখস্ত আছে ?

মাইয়া খুব জোরে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললো, বাবুজি, তোমার কোন কিছুই আমি ভুলিনি, ভুলব না। সত্যি বাবুজি, কোনদিন কিছু ভুলতে পারব না।

পরের দিন সকালে দুজনের ঝুলন্ত দেহ দেখেই সূর্যকান্ত মূর্ছা গেলেন। পরে পুলিস থেকে ওকে মাইয়ার একটা চিঠি দিল—বাবুজি, যাচ্ছি কিন্তু তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারব না। সামনের জন্মে না হলেও তার পরের জন্মে তুমি আমার পেটে জন্মাবেই। আর একটা কথা বাবুজি। সে-কথা তোমাকে না বলে এ পৃথিবী ছাড়তে পারছি না। আমি না, নরেশ ভগবতীকে খুন করে। বোধহয় না করে উপায় ছিল না। ভগবতী আমাদের খুব খারাপ অবস্থায় দেখেছিল বলেই……

সূর্যদার দু' চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। আমারও দৃষ্টি ঝাপসা। পাশ ফিরে তাকিয়ে দেখি ফটিকবাবু, রবিবাবু, তারাবাবু, সুনীল সেন, সুভাষবাবু, চাঁদ, ঘর ভরতি সব উকিলবাবুর চোখেই জল। যে উকিলবাবুদের এতদিন মনে মনে ঘেন্না করতাম তাদের প্রত্যেককেই এক একজন সূর্যদা মনে হলো। মনে হলো, মাইয়া এদেরও মা, এদেরও মেয়ে।